প্রেতাত্মার সন্ধানে

স্মরজিৎ মিত্র

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

বিষয়সূচী

১

পরলোকের কথা

'ভূত' মানে অতীত, বিগত, past. কথ্য বাংলায় 'ভূত' মানে প্রেত, ghost. ভূত, প্রেত বা ghost কথাটির অভিধানিক অর্থ মৃত ব্যক্তির দেহহীন spirit বা আত্মার অস্পষ্ট ছায়ামূর্তিতে লোক-সমক্ষে প্রকাশ। Ghost শব্দটি প্রাচীন ইংরাজী (saxon gaste অথবা gest) থেকে এসেছে। উত্তর ইংলণ্ডে guest কথাটির অপর এক অর্থ apparition, অপছায়া, অর্থাৎ ভূত।

ভূতের অস্তিত্ব, আকার, কর্যোবলী, অভিপ্রায় প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের সবার একটা নিজস্ব অভিমত আছে। কেউ মনে করেন ভূতের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য এবং ভূত-তত্ত্ব গভীরভাবে আলোচ্য। অপর পক্ষে অনেকের মতে ভূতপ্রেতের কাহিনী শিশুসাহিত্যের উপজীব্য। আমরা বিশ্বাস করি আর না করি, অশরীরী বস্তুর অস্তিত্ব একটি আশ্চর্য ঘটনা। এ বিষয়ে ভূত-তত্ত্ব-অভিজ্ঞরা ভৌতিক অস্তিত্বের যথার্থ সম্বন্ধে পাঁচপ্রকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

ক) মানুষের পূর্ব জন্ম আছে। ভূতেরা সেই সব জন্মের পোষাকে আচ্ছাদিত হয়ে পূর্ব মূর্তিধারণ করে প্রকাশ পায়।

খ) অশরীর বিষয় জ্ঞানলাভে যাঁদের দক্ষতা আছে তাঁরা তাদের ছায়া দেখতে পান।

গ) বিদেহী আত্মার সঙ্গে অন্য কোন বস্তুর মিশ্রণে দো-আঁসলা সত্ত্বা হ'চ্ছে ভূত।

ঘ) বিশ্বজনীন আকর্ষণ ও ভীতির সম্মেলনে স্মৃতি যন্ত্রের উপর আত্মজ্ঞানের স্তবকের স্থাপনে ভূতের সৃষ্টি।

ঙ) সত্যিকারের ভূত আমরা দেখতে পাই—মৃতের আত্মা কোনো রকমে দেহগঠন সম্পন্ন করে জীবিত কালের বাসস্থান দেখতে আসে।

ভূত সম্বন্ধে যে সব বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এই পঞ্চবিধ সংজ্ঞার দ্বারা করা সম্ভব নয়। কিন্তু পাশ্চাত্তের প্রখ্যাত আত্মাতত্ত্ববিদ টিরেল এর উক্তির মৌলিক সত্যতা এর দ্বারা প্রমাণিত হয়; "ভূতের আকর্ষণ এত দুর্নিবার কেন? কারণ মৃত্যুর পর যে অজানা জীবন তার জন্য মানুষের মনে যে স্বাভাবিক কৌতূহল আছে তারা (ভূতেরা) তার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে ছায়।"

ভূতকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম শ্রেণীর ভূত নিরীহ, তারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়, কখনো কখনো মানুষের কাছে বিশেষ বার্তা বা সাবধান বাণী পৌঁছে ছায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূতেরা ক্ষতিকারক, দুষ্টপ্রকৃতি এবং গোলযোগ সৃষ্টিকারী (polter geist)। এরা জিনিসপত্র আসবাব ইত্যাদি ছোড়াছুড়ি করে মানুষকে আহত করে। তৃতীয় দলের ভূতেদের বলা হয় 'fetch', জোড়া, অর্থাৎ জীবিত বা মুমূর্ষু ব্যক্তির দ্বিতীয় মূর্তি। এরা জীবজন্তুর ছায়ামূর্তি, কখনো বা প্রাণহীন বস্তুর ছায়ামূর্তি, যেমন ভৌতিক জাহাজ, phantom ship। এরা ঘুরে বেড়ায় নির্জন, আবর্জনাময়, অব্যবহার্য স্থানে।

ভূতকে কিন্তু ইচ্ছামতো বা আদেশ মতো আনা যায় না। অশরীরী আত্মার গবেষণাকারী বহু ব্যক্তি রাতের পর রাত অপেক্ষা করেছেন ভৌতিক আত্মার আবির্ভাবের পথ চেয়ে। যদি তারা আবির্ভূত হয় তবে উপস্থিত জনতার মধ্যে মাত্র একজন হয়তো তাদের দেখতে পায়। ভূতের সাক্ষাৎ পেলে কী করতে হবে এ বিষয়ে ভূত-বিশেষজ্ঞ (ভূত-শিকারী বলা চলে) হ্যারী প্রাইস মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন তাঁর অধুনা দুর্লভ বহুবাঞ্ছিত পুস্তকে ("Blue Book for Psychic Investigations"): নড়বে না, ভূতের দিকে এগোবেনা, যদি ভূত কথা বলে, তুমি কিন্তু কাছে যাবে না, শুধু তার নাম, বয়স, স্ত্রী না পুরুষ, আগমনের হেতু, মুশকিলে পড়েছে কিনা, পড়ে থাকলে কী করে মুশকিল আসান হয় ইত্যাদি সব জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবে। আবার তাকে আসতে বলবে,

নির্দিষ্ট স্থান ও সময় বলে দিয়ে। সে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত অচল থাকবে কী। করে ভূত অদৃশ্য হ'ল লক্ষ্য করবে। যদি উন্মুক্ত দরোজা দিয়ে যায়, তবে ধীরে ধীরে পিছনে যাবে। যদি নিরেট বস্তুর (যেমন দেওয়াল) ভিতর দিয়ে যায় তা হলে লক্ষ কর, অপর দিক থেকে দৃষ্ট হয় কিনা।

অনেকে ভূত দেখেন নি। কিন্তু বহু শতাব্দী ধরে মানুষের উপর একটা চিরস্থায়ী ছাপ রেখেছে এই অশরীর আত্মারা। সেদিক থেকে এরা অমরত্বলাভ করেছে। যাঁরা দেখেছেন তাঁরা এদের ছবি এঁকে চিরজীবি করে রেখেছে। প্রাচীন ব্যবিলনবাসীরা মাটির ফলকে, রোমানরা চামড়ার কাগজে ছবি এঁকে, মধ্যযুগের লোকেরা কাঠের উপর খোদাই করে, সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে অপূর্ব চিত্রাঙ্কনে, ভিক্টোরিয়ান যুগে বক্স-ক্যামেরার সাহায্যে এবং অধুনিক যুগের দ্রুতগতিসম্পন্ন পোলারয়েড (polaroid) ছবির সহায়তায় ভূতদের যুগ যুগ ধরে ইতিহাসে বিধৃত করে রাখা হয়েছে।

সমসাময়িক ঘটনার বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ যা অঙ্কন, খোদাই ও ফোটো দ্বারা সমর্থত হয়েছে তার বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে। ভূতের গল্প প্রচলিত আছে পৃথিবীর সব দেশে। এখানে শুধু বিশ্বাসযোগ্য, সত্য বলে প্রমাণিত ঘটনাগুলি, যা সত্য সত্য আলোচিত হয়েছে ছবি ও ফোটোর সাহায্যে, তার বর্ণনা ও বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ভূত চিরন্তন আকষর্ণের বস্তু, তার অনুপম ইতিহাস-এর বিচিত্র বর্ণনা মিলবে এখানে। রাজারাণীর ভূতের কাহিণী সুবিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে বিভিন্ন গ্রন্থে, বাহুল্য বোধে সে সব কাহিনী এখানে দেওয়া হল না। ভূতের অস্তিত্বের সত্যতা বা অলীকতা আমাদের আলোচ্য নয়। প্রচুর সাক্ষী-প্রমাণ এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

২

ভুত দেশে দেশে

ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ ভূত-শিকারী জন র‍্যাড্‌ক্লিফ তাঁর "Fiends, ghosts and Sprites" গ্রন্থে (১৮৫৪) বলেছেন, "সব দেশে সব যুগে মানুষ অপ্রাকৃতির (Supernatural) বিষয়ে আস্থা রেখেছে।" বিশ্বাসী ও সন্দেহবাদী সবাই ভূতপ্রেত, অপছায়া, পিশাচ, দানো প্রভৃতি সুপারন্যাচারল বস্তুতে আকৃষ্ট হয়েছে। এমন গ্রাম খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখাতে ভূতের গল্প নিয়ে কাহিনী চালু নেই। এমন পরিবার নেই যেখানে বৃদ্ধবৃদ্ধাদের মুখের শোনা ভৌতিক কাহিনী শিশুদের (পিতামাতাদেরও) আনন্দ ও ভয় ছায়নি বা দিচ্ছে না। সংক্ষেপে বলা যায় ভূতের সঙ্গে পরিচয় কমবেশী সবারই হয়েছে গল্পে কাহিনীতে ও বইয়ের মাধ্যমে।

মৃত মানুষের আত্মা মর্তে ফিরে আসে, দেখা ছায়, কথা বলে, ইঙ্গিতে খবর জানায়—এ ধারণা প্রস্তর যুগ থেকে চলে আসছে মনুষ্য সমাজে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ কী পরিমাণে বিদেহী আত্মার দ্বারা উপকৃত বা বিড়ম্বিত হয়েছে সে তথ্য এখন নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে অতি প্রাচীন যুগের লেখা মাটির ফলকে ভূতের কাহিনীতে সে সময়ের মানুষের ভৌতিক বিশ্বাসের প্রমাণ মেলে। ব্যাবিলনের সেমিটিক জাতির মধ্যেও অশরীরী আত্মার অস্তিত্ব বিশ্বাসের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ইউফ্রেতীস উপত্যকায় প্রাচীন সুমেরিয়ানদের কাছ থেকে এ বিশ্বাস তারা পেয়েছিল। সুমেরিয়ানরা মনে করত মৃতের আত্মা পৃথিবী দর্শনে সদাই আগ্রহী।

আদিম লোকেরা বিশ্বাস করতেন যে বিদেহীরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমটি মৃতের আত্মা। দ্বিতীয়টি ভয়ঙ্কর অপচ্ছায়া বা

পিশাচ, এরা মানুষকে জ্বালাযন্ত্রণা দ্যায়। তৃতীয়টি অর্ধেক মানুষ অর্ধেক ভৌতিক ছায়ার সম্মিলনে তৈরী, এরা মানুষের ও ভূতের সন্তান। আসিরিয়ান (Assyrians) বাসীরা সর্বপ্রথম ভূতের কাহিনী সৃষ্টি করে। তারাও তিন জাতির প্রেতাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। 'উতুক্কু' (utukku) ভূত শ্মশানে কবরখানায়—জনশূন্য স্থানে ঘুরে বেড়ায় এবং এদের দর্শনেই মানুষ রোগাক্রান্ত হ'ত। 'আলু' (alu) ভূতেরা কবন্ধ, কখনো বা মস্তক কর্ণ হস্তপদহীন হ'য়ে ভয়ঙ্কর মূর্তিতে দেখা দিয়ে মানুষকে জড়িয়ে ধরত। এরা ঘরে ঢুকে পর্যন্ত মানুষকে ভয় দিত। 'একিম্মু' (ekimmu) অত্যন্ত ঘরোয়া ভূত। যে মৃতদেহ কবরস্থ করা হয়নি তার প্রেত হচ্ছে 'একিম্মু'। ঘরে প্রবেশ করে এ ভূত পরিবারে কারো আসন্ন মৃত্যুর কথা ঘোষণা করত, কখনো বা চীৎকার চেঁচামেচি গোলমাল করত। মৃতব্যক্তির দেহ কবরস্থ না করলে বা যথোচিত নিয়মে কবরস্থ না করলে আত্মারা ভূতগ্রস্থ হয়ে দেখা দেবেই আসিরিয়ানদের এ বিশ্বাস ছিল অত্যন্ত দৃঢ়।

প্রাচীন যুগের ভূতের খুব বেশী বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্যবিলনে একটি নাটকীয় ভূতের গল্পের বই রয়েছে। এখন থেকে চার হাজার বছর আগে রচিত "এপিক অব গিলগ্যামিশ" এ সব চেয়ে পুরানো ভূতের কাহিনী বর্ণিত আছে। গিলগ্যামিশ ব্যাবিলনের একজন বীরপুরুষ। সে দেবতা নেগ্রাল (Negral) এর কাছে আবেদন করে তার মৃত বন্ধুকে ফিরে পাবার জন্য। স্বচ্ছ মানুষের আকৃতি নিয়ে হাওয়ার বেগে মৃত বন্ধুর অপচ্ছায়া আবির্ভূত হল গিলগ্যামিশের সামনে।

প্রাচীন মিশরীয়দের ভূতপ্রেত নিয়ে অনেক কারবার ছিল। ভূতদের সন্তুষ্ট না করলে তারা সর্বত্র ঘুরে বেড়াত মানুষের ক্ষতি করবার মতলবে। মানুষের দেহ মনের সম্বন্ধে মিশরীদের ধারণা ছিল অদ্ভুত। সেই ধারণা থেকে ভূতের উৎপত্তি। তারা মনে করত

মানুষ মাত্রেই আছে—শারীরিক দেহ, আত্মিক দেহ, ছায়া, আত্মা, হৃৎপিণ্ড, 'খু' নামে স্পিরিট, শক্তি ও নাম। মৃত্যুর পর 'খু' অসুখী আত্মা হ'য়ে ঘুরে বেড়ায়, মানুষের রোগ-এর সৃষ্টি করে, এমন কি জীবজন্তুর দেহে প্রবেশ করে তাদের পাগল করে দেয়। আত্ম-হত্যাকারী, প্রাণদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তি, সমুদ্রে নিমজ্জিত লোক এবং অকবরস্থ দেহের 'খু'-এরা অত্যন্ত হিংসুটে ও ক্ষতিকারক।

নানাবিধ পূজা-আচ্চা দ্বারা মিশরীয়েরা ভূতপ্রেতকে তুষ্ট রাখত। মৃতের আত্মার সঙ্গে খবরাখবর লেনদেন করত। কাইরো মিউজিয়মে চামড়ার কাগজে খোদিত বিবরণে দেখা যায় খনসু-এম-হেব নামে একজন পুরোহিত ভূতের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিল এবং তার নিজের জীবনের অনেক তথ্য ও ভবিষ্যত জানতে পেরেছিল। মিশরীয়েরা দুষ্ট আত্মাকে খুশী করার জন্য তার কবরের উপর কাগজ (Scroll) রেখে দিত—কাগজে লেখা থাকত অত্যাচারিত ব্যক্তি কোন অন্যায় করেনি, মৃত্যুর পর ওসিরিশের বিচারালয়ে সে অবশ্যই নির্দোষ প্রমাণিত হবে ও পরলোকে সুখের জীবন লাভ করবে।

আরবেরাও নানান জাতীয় ভূতপ্রেত বিশ্বাস করত। কোন মানুষকে হত্যা করলে তার রক্ত যেখানে পড়ত সেখানকার ভূমি থেকে আফ্রিত বা ভূত আবির্ভূত হ'ত। তবে যদি একটি নতুন পেরেক সেখানে পুঁতে দেওয়া হ'ত তবে ভুত উঠতে পারত না, 'Nailing down the ghost' কথাটা এই বিশ্বাস থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। তা ছাড়া ভ্যামপায়ার এর কাহিনীর উৎপত্তি এই একই উৎস থেকে। ভ্যাম্পায়ার এক জাতীয় রক্তপিপাসু প্রেত যারা নিদ্রিত মানুষের রক্ত পান করে।

প্রাচীন যুগে সব দেশের ভূতের কাহিনী একই ধাঁচের। পোড়ো ভাঙা পরিত্যক্ত বাড়ীতে ভূতের আড্ডা জমতো সে যুগে। যদিও মানুষের বসতিস্থল তারা পছন্দ করত, কিন্তু সে সব গৃহ মন্ত্রপূত বা

কবচ-মাদুলীদ্বারা সুরক্ষিত থাকত। তাই ভূতের প্রবেশ সেখানে নিষিদ্ধ। ভূতের ভয়ে বা প্রেতদর্শনে মানুষের চুল যে খাড়া হয়ে উঠত, তা সে সব দেশের গল্পেই আছে। চার হাজার বছর আগেকার আসিরিয়ার একখানি কেতাবে ভূত-দেখা একজন মানুষের বর্ণনা আছে—

He, the hair of whose body an evil
Fiend hath set on end.

দুষ্ট পিশাচ দর্শনমাত্রেই ভয়ে খাড়া হয়ে উঠল তার দেহের রোমাবলী। দেহ ও ভয়ে কম্পিত হতে থাকত এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করে ভূত তাড়ানো হ'ত। 'ভূত তাড়ান' (laying ghosts or exorcism) হ'ত পূজাআচ্চা প্রার্থনার দ্বারা। ব্যাবিলনবাসীরা ও তাদের আগের যুগের লোকেরা বাতি জ্বালিয়ে ধূপ-ধুনো পুড়িয়ে ভূত ছাড়াত। এই সমস্ত প্রাচীন গল্পে বলা হয়েছে যে ভূতের মানুষের মত আকৃতি ও মুখ ছিল। অবিশ্বাসীরা মনে করেন আজকালকার ভূতের গল্পে আমরা বোকা বনছি। সান্ত্বনা এই যে আমাদের পূর্বপুরুষেরাও যুগ যুগ ধরে একই প্রকারে বোকা বনে এসেছেন।

ভূতপ্রেতের প্রচুর কাহিনী ও বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায় গ্রীক ও রোমানদের পুরানো কাহিনীতে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন মৃত ব্যক্তির ('manes') পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়, দুষ্ট লোককে ভয় দেখায়, সাধুজনকে শঙ্কিত করে, মানুষের কাজেকর্মে বাধা জন্মায়। ধার্মিক ব্যক্তির আত্মাকে তাঁরা 'lemures' বলতেন। দেবতাজ্ঞানে তাঁরা ভূত পূজা ('dii manes') করতেন। রোমানদের কবরের উপর রক্ষিত প্রস্তরে লেখা থাকত D. M. অথবা D. M. S. (Dis Manibus অথবা Dis Manibus Sacrum) অর্থাৎ পবিত্র ভূত-দেবতার উদ্দেশ্য উৎসর্গীকৃত।

ছ'শত তিরিশ খৃষ্ট-পূর্ব লেখা হোমারের 'ওডিসি' কাব্যে গ্রীকদের

ভূত সম্বন্ধে ধারণার হদিশ মেলে। ভূতপ্রেতের সঙ্গে কয়েকবার ইউলিসিস-এর দেখাসাক্ষাৎ হয় সমুদ্র যাত্রার সময় এবং ভৌতিক ব্যাপারে সমসাময়িক গ্রীকদের মনোভাবের পরিষ্কার পরিচয় পাওয়া যায়—

Thus solemu rites and holy vows we paid
To all the phantam nations of the dead.

... ...

When lo! appear'd along the dusky coasts,
Thin airy shoals of visionary ghosts.

... ...

Astonished at the sight, aghast I stood
And a cold fear ran shivering through my blood.

কিন্তু ভার্জিলের 'ইনিয়ীড' (Aeneid) কাব্যে যে প্রেতের বর্ণনা আছে তা আধুনিক প্রেতের গল্প মনে হয়—

'Twas in the dead of night, when sleep repairs
Our bodies worn with toils, our minds with cares,
When Hector's ghost before my sight appears:
A bloody shroud he seem'd, and bath'd in tears.

ভার্জিল আরো বলেছেন, যে মৃতদেহের সৎকার হয়নি তার ভূতকে ষ্টাক্স্ (Styx-বৈতরনী) নদী পার করে দিতে খেয়ার মাঝি কেরন (Charon) রাজী হ'ত না—শত শত বছর ধরে নদীর এপারে তাদের অপেক্ষা করতে হ'ত।

গ্রীক রসসাহিত্যের প্রখ্যাত লেখক লুসীয়ান (Lucian) ভূতের রাজ্যে হালকা সুরে কথা বলে 'ভূতের ক্লাব' এর অবতারণা করেছেন। ক্লাবের মেম্বাররা ভূতপ্রেত ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতেন, যেমন আজকাল আমরা করি 'psychic research' নাম নিয়ে।

রোমানদের ইতিহাস প্রেতের কাহিনীতে ভরপুর। লেখক প্লিনি একটি চমৎকার গল্প বলেছেন। এথেন্সের একটি ভূতুড়ে বাড়ীতে গভীর রাত্রে একটি প্রেত শৃঙ্খল টেনে ঝন্‌ঝন্ শব্দ করে ঘুরে বেড়াত। দার্শনিক এথেনোডোরস সে বাড়ী ভাড়া নিয়ে পড়াশুনা করছেন এক রাতে। হঠাৎ ঝন্‌ঝন্ আওয়াজ, এথেনোডোরস শুনেও শুনলেন না, পড়ায় ব্যস্ত থাকলেন। কিছু পরে মুখ তুলে তাকালে ভূত তাঁকে ইসারা করে বাইরে আসতে বলল। ভূতের সঙ্গে বাইরে এলে ভূতটি একটি জায়গায় প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ত্বরিতে অদৃশ্য হ'ল। বিস্মিত দার্শনিক পরের দিন জায়গাটার মাটি খুঁড়লেন। অবাক হয়ে দেখলেন শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি কঙ্কাল সেখানে শয়ান রয়েছে। কঙ্কালটিকে তিনি প্রকাশ্যে দাহ করলেন। তারপর আর ভূতের উপদ্রব হয়নি।

সিজার এর অপমৃত্যুর কথা একটি ভূত এসে তাঁর স্ত্রী কালফুর্ণিয়াকে বলে যায় এ তথ্য ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। হত্যাকারী ব্রুটাস এর সামনে সিজার-এর ভূত উপস্থিত হয়েছিল এ কাহিনী ও সকলের জানা। হতভাগ্য ব্রুটাসের সামনে ভূত আবার এসেছিল গ্রীসের রণক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যু অদূরে একথা জানাতে। সে অপচ্ছায়ার বিরাট দেহ, রক্তহীম মুখমণ্ডল। স্তম্ভিত, ভীত ব্রুটাস জিজ্ঞাসা করলেন, "কে তুমি? মানুষ না দেবতা? কী চাও?" প্রেত উত্তর দিল, "আমি তোমার দুষ্ট প্রেত। রণভূমিতে আবার দেখা হবে।" ব্রুটাস এর পরাজয় ও মৃত্যুর পূর্বরাত্রে সে দুষ্ট প্রেত সত্যি সত্যি এসেছিল রণাঙ্গনে। ইতিহাস-এর এ কাহিনী সেকসপীয়ার তাঁর নাটকে কাজে লাগিছেন।

উত্তর য়ুরোপে এ সময় দেদার প্রেত কাহিনী প্রচলিত ছিল। অন্যান্য দেশের মত স্কান্দিনাভিয়ানরাও কবরের উপর পূজা-আচ্চা মন্ত্রপাঠ ইত্যাদি করত মৃতের প্রেতকে খুশী করতে এবং সুখের রাজ্যে পৌছে দিতে। এদের প্রাচীন কাহিনী ও ইতিহাসে (হেলগে

ও সিগ্রুন এবং ইয়ারবিগিয়ান উপকথা) বহু গল্প বিধৃত আছে। একটি কাহিনীতে আছে, আইসল্যাণ্ডের মুমূর্ষু একজন নারীর ইচ্ছা পূর্ণ না করায় প্রেত এসে সে পরিবারের লোকদের ভয় দেখাত ও তাড়না করত।

ভারতেও অনুরূপ ভীতিকর প্রেত পিশাচ পেত্নী শাঁকচুন্নী প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু কাহিনী গল্প প্রচলিত আছে। প্রেত দেখতে ভয়ঙ্কর, দেহ রক্তবর্ণ, দাঁত সিংহের মত। অন্ধকারে, গভীর রাতে ঘুরে বেড়ায়, নাকী সুরে কথা বলে। এদের শান্ত করার জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট পাথরের বা মাটির ঘর গড়ে মূর্তি রাখা হত এবং সময় সময় খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদি নৈবেদ্য হিসাবে দেওয়া হত। দুষ্ট প্রেতদের তাড়ানোর জন্য ওঝা নামে এক জাতীয় মন্ত্রদক্ষ লোকও ছিল (বা আছে)। তারা মন্ত্র পড়ে, নানা জাতীয় মশলা (শুকনো লঙ্কা, সরষে) পুড়িয়ে শাকচুন্নী তাড়াত। মানুষকে 'ভূতে পেত' তখন ওঝা বা রোজা এসে ভূতপেত্নী দূর করে দিয়ে মানুষকে মুক্তি দিত। ভূতদের বাসস্থান পোড়া বাড়ী শ্মশান, বট, অশ্বত্থ, সাড়া, তেঁতুল গাছ প্রভৃতি। পরিত্যক্ত ভূতপ্রেত বাড়ীকে 'হানাবাড়ী' বলে। মৃতব্যক্তির আত্মা আকাশে নিরালম্ব বায়ুভূতনিরাশ্রয় হয়ে থাকে এবং পুত্রপ্রদত্ত নীর ক্ষীর গ্রহণ করে সুস্থ হয়। পরে শ্রাদ্ধাদি কাজকর্মের দ্বারা তার মুক্তি হয়—এ বিশ্বাস হিন্দুসমাজে আজও বর্তমান। হিন্দুরা পূর্বজন্ম ও পুনর্জন্মে আস্থাবান। আত্মা অমর—মুক্ত আত্মা আবার জন্মগ্রহণ করে। পুণ্যবানের আত্মা জন্মায় শুচীনাং শ্রীমতাং গৃহে, কিন্তু পাপীর আত্মা নীচযোনিতে জন্মায় বারবার। এ কথা হিন্দু শাস্ত্রে আছে।

হিন্দুদের শাস্ত্রে মহাকাব্যে পুরাণে স্বর্গত পিতৃপুরুষের মর্তে আগমন ও সন্তানদের যথোচিত উপদেশদান এর উল্লেখ দেখা যায়। অর্থাৎ ভারতীয় কল্পনীয় mobevolent ও benevolent

(ক্ষতিকার ও উপকারক) উভয় রকমের বিদেহী আত্মার উপস্থিতি সম্ভব। রামায়ন মহাভারতে প্রচুর উল্লেখ রয়েছে আত্মা এসে মনুষ্য মূর্তিতে জীবিতদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ আলাপ আলোচনা করছেন। দশরথের প্রেতাত্মা রামচন্দ্র সীতাকে দেখা দিয়াছেন। কাতর কুন্তীর করুণ আবেদনে বিগলিত মহর্ষি ব্যাসদেব বিগতদেহ মহাবীর কর্ণকে আনয়ন করেন শোক-সন্তপ্তা জননীর সামনে। ব্যাসদেব যেন এখানে মিডিয়াম এর কাজ করেছেন।

চীনদেশেও ভূতের উৎপাত ছিল। বিশেষ করে যাদের হত্যা করা হত তাদের আত্মারা ভয়ঙ্কর মূর্তিতে দেখা দিত। চীনে ভূত প্রথমে নিরবয়ব, ক্রমে মাথা, পা, পরে সম্পূর্ণ দেহ নিয়ে প্রকাশ পেত এদের মুখে থুতনি নেই। চীনদেশে দেশাচারে ও সাহিত্যে (প্রাচীন নাটকে) ভূতের কাহিনী অঢেল। জীবিত অবস্থায় ব্যবহৃত পোঁযাকাদি পরে ভূতেরা আবির্ভূত হত। তাদের দেহ ঘিরে নীল রংয়ের আলো জ্বলজ্বল করত। ষাট রকমের 'শিন' অর্থাৎ দুষ্ট ভূতের অস্তিত্বে চীনেরা বিশ্বাস করে। এক একদিন একজন করে দেখা দেয়। ভূত তাড়ানোর জন্য ঘরের দেওয়ালে মাদুলী টাঙিয়ে রাখা হয়। লোহায় নির্মিত মাদুলীর গায়ে ছিদ্রযুক্ত মুদ্রা ও যোদ্ধাদের মূর্তি ঝোলানো থাকে। ভূতপ্রেতকে খুশী করবার জন্য চীনেরা অদ্ভুত এক উৎসব পালন করে। পিঠে তৈরী করে তার উপর লিখে রাখে ভূতের জন্য নিমন্ত্রণলিপি ("For honourable homeless ghosts")।

জাপান-এর ইতিহাসে নানা জাতীয় ভূত পেত্নীর উল্লেখ বর্তমান। এদেশে আবার ভূতের চেয়ে পেত্নীর সংখ্যা বেশী। শুভ্র আবরণে আবৃতা, আলুলায়িত কুন্তলে মুখমণ্ডল ঢাকা, পেত্নীরা যত্রতত্র চলাফেরা করে স্বচ্ছন্দে। আর দৃষ্ট হয় সামুরাই যোদ্ধাদের প্রেতাত্মা, তরবারি হস্তে বীরদর্পে ভ্রাম্যমান। এদের পা নেই, দেহে ক্ষতচিহ্ন। জাপানী ভূতপেত্নীরা কিন্তু হিংসুটে বা ক্ষতিকারক নয়। তবে

প্রয়োজন হলে এরা দুষ্টুমি করতে ছাড়ে না। এরা আবার শেয়াল এর মূর্তিতে বেড়ায়, ইচ্ছামতো সুন্দরী নারীমূর্তি ধরে পথিকদের বিভ্রান্ত করে।

উত্তর আমেরিকায় রেডইণ্ডিয়ানরা প্রাচীন যুগ থেকে প্রেতের অর্চনা করে এসেছে। মৃত আত্মার সামনে এরা যে ভূত-নৃত্য (ghost dance) করে তা অতি বর্ণময় ও উদ্দীপক। আমেরিকায় এই ভূত-প্রেতরা খুব চেঁচামেচি করে। আমেরিকানরা বিশ্বাস করে যে মৃত ব্যক্তির অপচ্ছায়ারা "ঝিঁঝি পোকার মতো গান করে।"

ক্রীশ্চান ধর্মের বিবর্তনের পথে মৃতের আত্মা ও ভূতের আবির্ভাব ঘটেছে প্রভূত পরিমাণে। ধর্মশাস্ত্রে যত্রতত্র এদের উল্লেখ আছে। ম্যাথু বলেছেন—শিষ্যেরা যখন যিশুকে জলের উপর হেঁটে যেতে দেখল তারা মনে করল এ নিশ্চয় ভূত ("they thought it had been a spirit")। লুক লিখেছেন—খ্রীষ্ট আবার তাদের মধ্যে আবির্ভূত হলে, তারা ভাবল এ যিশুর অপচ্ছায়া হবে।" খ্রীষ্টান পুরোহিতরাও স্পিরিট বা ভূতের উল্লেখ করেছেন।

আফ্রিকার উপমাল এর বিশপ লিখেছেন যে তাঁর তিনজন সহকর্মী মৃত্যুর পর তাঁর সঙ্গে দেখা করে যা যা সব বলেছিলেন তা সব ভবিষ্যতে ঘটেছে। বিশপের বিশ্বাস যে মৃত্যুর পর স্পিরিটের মৃতপূর্ব চেহারার মতই আকৃতি থাকে ("Not unlike its human form")। গৃহে ও গির্জায় ভূতপ্রেত এসেছে, ঘুরে বেড়িয়েছে ও প্রার্থনার বাণী উচ্চারণ করেছে, এ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

বাইবেল এর বিখ্যাত ভূতের গল্প "সামুয়েল" এ বর্ণিত আছে, রাজা সল ফিলিস্তাইন বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধের ফলাফল জানতে চান। সামুয়েল এর ভূত সল এর পরাজয় ও মৃত্যুর কথা বলে। অবশ্য এ ঘটনা নিয়ে শাস্ত্রকাররা বহু তর্কবিতর্কের অবতারণা করেছেন। ডাইনীটি চোখের বিভ্রম ঘটিয়ে ভেন্ট্রিলোকুইজম (Ventriloquism)

এর সাহায্যে সমস্ত ব্যাপারটি সৃষ্টি করেছে, এ কথাও উঠেছিল। ঘটনা যাই হক না কেন বাইবেল এর ইতিহাসে ভূতের বেশ একটা স্থান ছিল তার প্রমাণ মিলছে এখানে।

বিখ্যাত ক্রীশ্চান যোগী সেণ্ট এন্তনী বহু ভূত প্রেত পিশাচ এর সঙ্গে মোলাকাত করেছেন। অনাহারে উপবাসে কঠোর ধ্যানধারণায় তপস্যায় তাঁর সময় কাটার জন্যে ভূতপ্রেত প্রভৃতি তাঁর কল্পনার চক্ষে ধরা পড়ত বলে অনুমান করা হয়। তাঁর খাদ্য রুটিতে এল. এস. ডি র উৎস লাইসাবাজিক অ্যাসিড মিশ্রিত থাকত বলে তিনি নানা প্রকার অপচ্ছায়া (vision) দর্শন করতেন এবং বিভিন্ন প্রকার প্রেতাত্মার সঙ্গে তাঁর লড়াই এর অত্যুৎকৃষ্ট ছবি এঁকেছেন বহু চিত্রকর। সুন্দরী প্রেতিনীর সঙ্গে মুখোমুখী সংগ্রামের চিত্রাঙ্কন খুবই প্রচলন হয়েছিল একসময়।

আজও খৃষ্টান ধর্মে ভূতপ্রেত স্পিরিট এর সম্ভবনা স্বীকৃত। হিংস্রুটে ও ক্ষতিকারক স্পিরিট বিতাড়নের জন্য ব্যবস্থাগ্রহণ (exorcism) এখনো খৃষ্টান সমাজে চলতি আছে।

হলাণ্ডের বিশিষ্ট ধার্মিক ও পণ্ডিত ইর্যাসমাস (Erasmus, 1466-1536) তাঁর একখানা চিঠিতে এক মজার ভূতের গল্প বলেছেন। একদিন এক ধনী ও অর্থলোভী মহিলার সামনে শ্বেতবস্ত্রাবৃত ও বিচিত্র শব্দকারী এক ভূত এসে হাজির। ভয় দেখিয়ে ভূতটি ভদ্রমহিলাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। মহিলাটি কিন্তু নির্ভয়ে বংশদণ্ড নিয়ে ভূতটিকে আগাপাস্তলা পেটাতে শুরু করেন। প্রাণের ভয়ে ভূতটি তখন কেঁদেকেটে ক্ষমাভিক্ষা করে। ভূতটি একটি নকল ভূত, অর্থলোভী একটি মানুষ।

৩

দুরাত্মা (Poltergeists) ও যাদুকর

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ষোড়শ শতাব্দীতে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার পর্যন্ত ইতিহাসের এই অন্ধকার যুগে ভূতপ্রেত বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে শিকড় গেড়েছিল মানুষের মনে। অলৌকিক ঘটনা ও স্পিরিট, দানো, পিশাচের প্রভুত্ব অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল মানুষের জীবনে। দৈত্য, ডাইনী, দানব, ভূত, প্রেত প্রভৃতি নিয়ে গল্পকাহিনী তৈরী হতে থাকে। শিশুদের জন্য নানান গল্পকাহিনী 'জ্যাক দি জায়ান্ট-কীলার', 'পুস ইন বুটস', 'সিনড্রেলা' ইত্যাদি গল্পের রচনা হল। গ্রামের আবহাওয়া রহস্যময় হয়ে উঠল। অভিজাতসম্প্রদায়ের প্রাসাদগুলি পরিত্যক্ত স্যাঁতাসাঁতে ভীতিপ্রদ বলে মনে হল। চাষীদের দরিদ্র কুটির হতচ্ছাড়া ও দুর্গন্ধময়। এখানকার প্রতিটি ছায়া ভৌতিক আকার গ্রহণ করল। দালানের দেওয়ালে কোনে মৃতের ভূত আস্তানা গাড়ল। গাঁয়ের রাস্তায় রাস্তায় অশ্বারোহী ভূতের দল খট্‌খট্‌ শব্দে চলাফেরা শুরু করল। বাড়ীতে বাড়ীতে চলল প্রেত পিশাচেব আনাগোনা।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্যালেসটাইন ধর্মযুদ্ধ (Crusade) বহু লিপিবদ্ধ ভৌতিক কাহিনীর জন্ম দিল। ম্যাথু প্যারিস এর "ইংলণ্ডের ইতিহাস" (১১৫৯) এ এসব কাহিনী বর্ণিত আছে। নাইল নদের পাড়ে সারাসেনদের সঙ্গে যুদ্ধে নিষ্ঠুরভাবে নিহত (১২৫০) একজন ইংরেজ যোদ্ধা, 'উইলিয়ম লডসোর্ড', এর মা পুত্রকে চিনতে পারেন এবং অতিশয় ভীতা হন। ভূত বলল, "আমি তোমার ছেলে উইলিয়ম, ঈশ্বরের সম্মান রক্ষার্থে আমি জীবন দিয়েছি।" মঠের কর্মীর কথা প্রথমে কেউ বিশ্বাস করেনি। ছ মাস পরে লোক

মারফৎ খবর পৌঁছে ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হয়। এই সময় ব্রিয়ার শাতো ব্লাণ্ডিতে (ফ্রান্সে) আর একটি সত্য ঘটনা ঘটে। শতো ক্লান্তি দুর্গের প্রাঙ্গনে কয়েকটি রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। একজন গোমস্তা রত্নালঙ্কার চুরি করে নিকটস্থ বৃক্ষের কোটরে রাখতে গিয়ে গর্তের মধ্যে পড়ে যায় ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অপর ভূতগুলির সঙ্গে তার প্রেতাত্মা যোগদান করে, মধ্যরাতে প্রেতগুলি দুর্গটির চারপাশে উড়ে বেড়ায় এবং অবশেষে প্রবেশপথের টাওয়ারের এর উপর গিয়ে বসে। সমস্ত রাত্রি ধরে শৃঙ্খলের ঝনঝন, চিৎকার চেঁচামেচি শোনা যেতে থাকে মাটির মধ্যস্থ প্রবেশপথে। কারো সাহস হয় না যে সরেজমিনে খোঁজখবর করে। এই ভূতের দলের নেতা পূর্বতন মালিক কাউন্ট দুনয়-এর প্রেতাত্মা। বছরের একটি বিশেষ দিনে তাকে দেখা যেত প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে থাকতে, সঙ্গে বর্মপরিহিত একজন সঙ্গী। তাদের উপস্থিতিকালে শোনা যেত তূর্যনিনাদ, অস্ত্রের ঝনৎকার ও যুদ্ধরত সৈন্যদলের মার্চের পদশব্দ।

জার্মানীর প্রাচীন দুর্গ রোজেনবের্থ-নিউহাউসে 'শ্বেতমহিলা' (White lady) নামে পঞ্চদশ শতাব্দীতে একটি পেত্নী ছিল। দুর্গ মালিকের পত্নী ছিলেন Perchta। জন্ম, ১৪২০, স্বামীর অকথ্য অত্যাচারে ও দুর্ব্যবহারে তিনি মনোকষ্টে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর দেখা যেতে লাগল দুর্গের বারান্দায় বারন্দায় শ্বেতবস্ত্রাবৃত বিধবা নারীর পোশাক পরিহিতা একটি মূর্তি হেঁটে বেড়ায়—তার বস্ত্রাভ্যন্তর থেকে অস্পষ্ট আলো ঠিকরে বেরোত। পরিবারের কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তাঁর দর্শন মিলত। নিকটস্থ অন্যান্য দুর্গেও তাঁকে দেখা যেত। তাঁর বিখ্যাত আবির্ভাব হয় বার্লিনে (১৬২৮) যখন তিনি একজন বংশধরকে বলেন, "Come, judge the living and the dead; my fate is not yet decided." জীবিতের দুঃখ তাঁর প্রেতাত্মার কণ্ঠে প্রাণহীন আপসোস হয়ে ফুটে বেরোচ্ছে।

অন্ধকার যুগে potter geiet (potter ghost, দুষ্ট ভূত)-এর প্রথম আবির্ভাব ঘটে। শব্দটি জার্মান, এর অর্থ 'যে ভূত শব্দ করে চেঁচায়'। এ আরো অনেক কিছু করে—জিনিসপত্র আসবাব সরায়, পাথর বা মাটি ছোঁড়ে, আসবাব ফেলে ছ্যায়, কখনো কখনো কারো গায়ে মেরে আঘাত করে, আর নানা প্রকার আওয়াজের সৃষ্টি করে—দরোজায় জানলায় ঠক্ঠক্ করা বা জোরে ঘুষি মারা বা আঁচড়ানো। কখনো বা মানুষের মত শিস ছ্যায়, গান করে বা কথা বলে। পোলটার ভূতের সর্বপ্রথম পরিচয় মেলে ৩৫৫ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর রাইন নদীর উপর বিঙ্গেন শহরে। সেখানকার লোকদের উপর অকথ্য অত্যাচার করত এই ভূতেরা। ঘুম ভাঙিয়ে বিছানা থেকে মানুষকে টেনে তুলত, পাথর ছুঁড়ত গায়ে, দরজার উপর করাঘাত হত বাড়িতে বাড়িতে। বিঙ্গেন-এর কাছে কেমবডেন-এ ৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ঝাঁকে ঝাকে প্রস্তরবৃষ্টি হত ও বজ্রবৎ গর্জন শোনা যেত। কখনো বা আকাশ থেকে দৈববাণী হত, একজন ষড়যন্ত্রকারী পুরোহিতের চরিত্রসম্বন্ধে দোষারোপ করা হত। স্থানীয় লোকদের দুশ্চরিত্র দুষ্কর্ম সম্বন্ধেও সাবধানবাণী উচ্চারিত হত। দুষ্কর্মের নেতার বাড়ি ঘর-দুয়োর সম্পত্তি সব সেই সময়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ভস্মীভূত হয়।

ইতালীও প্রাচীন যুগ থেকে এই ভূতদের পাল্লায় পড়েছিল। ৫৩৪ থেকে ৫৬২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কয়েকবার মানুষকে লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়ার ঘটনাও ঘটেছিল।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ক্যামব্রেনসিস-এর মতে ইংলণ্ডের পেমব্রোকে দ্বাদশ শতাব্দীতে পোলটার ভূতের আবির্ভাব হয়। এ ভূতটি কাদা ছুড়েছিল, পোশাক-আষাক ছিড়েছিল, ক্রুদ্ধস্বরে কথা বলেছিল ষ্টিফেন উইরিয়েট ও উইলিয়াম নট এর সঙ্গে। পুরোহিতেরা এদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। কিছুদিন পর প্রথম রিচার্ড-এর রাজত্বকালে (১১৮৯-৯৯) সাফোকের সার এসবর্ণ-এর বাড়িতে পোলটার-এর উৎপাত হয়। এ ভূতটি অনেকের সঙ্গে কথা

বলেছিল, অনেকের গুপ্তকাহিনী প্রকাশ করে দিয়েছিল। বেশ কিছুদিন সে বাড়িতে বসবাস করেছিল।

ফ্রান্সের আলে শহরে চতুর্দশ শতাব্দীতে একটি বিকট ভূতের ("Grisly gaist of eye") আবির্ভাব ঘটে। অদ্ভুত চেঁচামেচি, পাথরছোঁড়া, মানুষকে কিল ঘুষি মারা প্রভৃতি সংঘটিত হয়েছিল। পোপের নির্দেশে এ ঘটনার অনুসন্ধান হয়েছিল, কিন্তু কোন কিনারা হয়নি। জ্যঁা বোঁদা কতকগুলি ঘটনার আলোচনা করেছেন ("Demonomanie des sorciers" গ্রন্থে)—তার একটিতে একটি অষ্টাদশী সন্ন্যাসিনী (nun)-র কথা বলা হয়েছে, যাকে কয়েকবার পোলটার ভূত আকাশে ছুঁড়েছিল এবং নানাপ্রকারে যন্ত্রণা দিয়েছিল।

য়ুরোপে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি ইনটারেসটিং কাহিনী ঘটেছিল। একটি নিদ্রিত শিশুর বিছানা থেকে নখের আঁচড় ও চড়চাপড়ের শব্দ হত। একদল ফ্রানসিসকান সন্ন্যাসী সরেজমিনে তদন্ত করে জানান ব্যাপারটা ভুয়ো এবং শিশুটাকে তাঁরা দোষী মনে করে শাস্তি দিতে বলেন। পোলটার ভূতের সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে অনেক সময় শিশুরা জড়িত থাকে এবং শিশুরাই ঘটনার জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়। অনেক সময় স্থির করা হয়েছে এই সব কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী ডাইনীরা। সপ্তদশ শতাব্দীতে ডাইনীবৃত্তির অসত্যতা প্রমাণিত হলেও পোলটার ভূতের অস্তিত্ব স্বাধীনভাবেই স্বীকৃত হতে থাকে।

মধ্যযুগে (পঞ্চম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী) য়ুরোপে যাদুকর ও অপরসায়নবিদদের (Alchemists) প্রাদুর্ভাব হয়। এরা নানা নিষিদ্ধ গুপ্ত শাস্ত্রালোচোনার দ্বারা সাধারণ ধাতুকে সোনায় পরিবর্তিত করতে সচেষ্ট হয় এবং মনুষ্য জীবনের গুপ্ত গূঢ় তথ্য আবিষ্কারে নিযুক্ত থাকে। অধিকন্তু এরা মৃতের আত্মার সঙ্গে সংযোগ সাধন ক'রে প্রয়োজনমত ভূতের আবির্ভাব ঘটিয়ে লোকের ভীতি উৎপাদনে সমর্থ হয়। ভূতপ্রেতের চরিত্র ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে অনেক তথ্য এরা

প্রচার করে। ফরাসী অপরসায়নবিদেরা প্রচার করেন যে কবরস্থ মৃতদেহ থেকে নুন বেরিয়ে আসে ধোঁয়ার আকারে এবং তাতেকোরে ধোঁয়াটে আকারের মানুষের সৃষ্টি হয়। কবরখানায় সেই জন্যে ভূতের আবির্ভাব হয়। জনৈক ফরাসী (যোসেফ লা পিয়ের) মনুষ্যরক্ত (যার ভিতর নুন আছে) বিভিন্ন উত্তাপে জ্বাল দিয়ে একটি পেত্নীর বায়বীয় অপচ্ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন (১৪৮২)। সে মূর্তিটি চেঁচামেচি করেছিল। তিনজন জার্মান অকাল্টিসট (অপরসায়নবিদ) ঘোষণা করেছেন গ্লাসের পাত্রে তাঁরা মানুসের ভূত দেখতে পেয়েছেন।

এ বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন জন ডি (Dee, ১৫২৭-১৬০৮)। দার্শনিক ও পণ্ডিত বলে তিনি পরিচিত হলেও লোকে তাঁকে মনে রেখেছে যাদুকর, নারকীয় কুকুরের সহযোগী ও ভূতপ্রেতের ভেলকিবাজ হিসাবে। সমস্ত য়ুরোপ ঘুরে তিনি নানান দেশের ভূতপ্রেতের কাহিনীর বই সংগ্রহ করেন, অনেক ভূতবিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরিচিত হন। ভূতপ্রেত আলোচনা করেই তাঁর অবশিষ্ট জীবন কাটে। ভূতেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন এবং এবং এইসব বায়বী পদার্থের সঙ্গে কথাবার্তার কাহিনী তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন যা ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। জন ডি'কে প্রেততত্ত্বের (Spiritualism) পথিকৃৎ বলা হয় এই সব কারণে। জন কেলী নামক একজন প্রতারকের সহযোগিতায়—তিনি লাঙ্কাশায়ারে এক কবরখানায় ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রপাঠ করে জনৈক মৃতের ভূতকে আনয়ন করেন এবং কথাবার্তা বলেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে কেউ কেউ কিন্তু ডি'র ভেলকিবাজীতে অবিশ্বাস করতে শুরু করে, ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে রেজিনালড স্কট নামে একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ভূত-প্রেত-ডাইনী-তন্ত্রে জোর অবিশ্বাস ঘোষণা করেন। কিন্তু সাধারণ লোকের বিশ্বাস অটল থাকে—সপ্তদশ শতাব্দী থেকে আবার অজস্র ভূতের আনাগোনা চলতে থাকে।

৪

ভৌতিক ঢাকী ও ভূতের সাবধানবাণী

সপ্তদশ শতাব্দীতে হাজার হাজার ভূতপ্রেতের আবির্ভাব ঘটে, তাদের কাহিনী নিয়ে বই লিখলে কয়েক শত খণ্ড পুস্তক লেখা চলে। ঐ সময়ে প্রায় সমস্ত প্রাসাদে, দুর্গে, ভগ্ন অট্টালিকায় ও গ্রামের পথ ঘাট রাস্তায় ভূতপ্রেত আস্তানা গাড়ত। কত যে অঘটন, রহস্যময় ভৌতিক ব্যাপার ঘটেছে তার ইয়ত্তা নেই। এরা স্বচ্ছ মূর্তিতে দেখা দিত না, কিংবা আর্তনাদ বা চিৎকার করত না। কিন্তু শৃঙ্খলের ঝন্‌ঝন্‌, ভূতুড়ে আওয়াজ, গুপ্তধনের নির্দেশ বা অপরাধীকে ধরিয়ে দেওয়া এ সব কাজ তারা যত্রতত্র সম্পন্ন করেছে। এইসব কৌতূহলজনক কাহিনীর কয়েকটির বর্ণনা নীচে দেওয়া হলো।

সপ্তদশ শতাব্দীর সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ভূত হচ্ছে টেডওয়ার্থে-এর ঢাকা (The Drummer of Tedworth)। ইংলণ্ডের আগেকার দিনের এটি একটি সত্যিকারের ভূত। উইলটশায়ারের টেডওয়ার্থে বাস করতেন জন সম্‌পশন্‌ নামে একজন ভদ্র, সম্মানিত ও বিবেকবান ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর বাড়িতে একদিন হঠাৎ ঢাকের বাদ্যি শুরু হল। বাড়ির শিশুদের আকাশে ছুঁড়ে দেওয়া, মানুষের মাথায় জুতো ছুঁড়ে দেওয়া, বিছানায় উপর প্রস্রাব পাত্র ঢেলে দেওয়া, ঘোড়ার পিছনের একখানা পা জন্তুটির মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া প্রভৃতি উপদ্রব যখন তখন চলতে থাকে। ১৬৬২ সালের বসন্তকালে এ ঘটনা আরম্ভ হয়ে এক বছর ধরে চলে। সম্‌প্‌শন এবং অনেকে এ সব ঘটনার সাক্ষী। কিন্তু ইতিমধ্যে একটা ব্যাপার হয়েছিল। একজন মিলিটারী ঢাকী ও যাদুকর জালিয়াতের অপরাধে সম্‌প্‌শনের কোর্টে বিচারার্থে প্রেরিত হয়। সম্‌প্‌শন তার ঢাকটি বাজেয়াপ্ত করে জেলা থেকে তাকে বহিষ্কার করেন। এ ব্যাপারের পরেই ম্যাজিস্ট্রেটের

বাড়ির মধ্যে প্রথমে, পরে ঘরের ছাদের উপরে ঢাক বাজনা শুরু হয়ে যায়। বহু লোক এসে ঢাকের বাজনা শোনে এবং ঢাককে ছাদের উপর আকাশে উঠতে ছাখে। কেউ কেউ মনে করেছিল এ সেই যাদুকরের কীর্তি। কিন্তু খবর নিয়ে জানা গেল সে চুরির অপরাধে গ্রেপ্তারে ধরা পড়ে ঘটনার আগেই দেশ থেকে নির্বাসিত হয়েছে। ঢাকীর গল্প দ্রুত দেশে ছড়িয়ে পড়ে। রাজা দ্বিতীয় চার্লসের (১৬৬০-৮৫) পুরোহিত রেভারেণ্ড গ্রানভিল তদন্তে এলেন। তিনি পর পর পাঁচ রাত্রি স্বকর্ণে ঢাকের বাজনা শুনলেন এবং বহুলোকের বিস্তৃত সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করলেন। তিনি ইয়র্কশায়ার ও লিঙ্কন-শায়ারে ভৌতিক ঢাকের বাদ্যি ও রাইফেলগুলির আওয়াজ সম্বন্ধেও ইতিপূর্বে (১৬৫৮) সরেজমিনে অনুসন্ধান করেছিলেন। ফলে, টেডওয়ার্থ-এর ঢাকের বাজনা আরো রহস্যজনক হয়ে উঠেছিল।

গ্লানভিলকে (Glanville, দ্বিতীয় চার্লসের ব্যক্তিগত পুরোহিত) আধুনিক সাইকিকাল রিসার্চের জনক বলা যেতে পারে। তিনি সযত্নে বিস্তৃতভাবে এইসব বায়বীয় অপ্রাকৃতিক ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করে ভবিষ্যৎ গবেষণার পথ খুলে দিয়েছিলেন। এর পর তিনি অলৌকিক তত্ত্বের আলোচনা ও গবেষণার জন্য ওয়ারউইকশায়ারে ব্যাগলি হলে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আলোচনা-সভা করেন। সেখানে হানাবাড়ী, ভূতপ্রেত, অপচ্ছায়া, পোলটার ভূত প্রভৃতি সম্বন্ধে গভীর আলোচনা হয়। যাঁরা ভূতকে আনায়ন করতে পারেন তাঁদের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলে তাদের পরীক্ষা করেন। পরবর্তীযুগে বিশেষ বিখ্যাত ভূতবিশেষজ্ঞ হ্যারী প্রাইস (Harry Price) কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন গ্লানভিল-এর তত্ত্বানুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রতি।

ঠিক এই সময়ে একই বছরে (১৬৬২) আমেরিকায় পোলটার ভূতের অত্যাচার শুরু হয়। প্লিমাউথ-এর জর্জ ওয়ালটন নামে একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে, জানলায় ও মানুষকে লক্ষ করে প্রস্তরনিক্ষেপ হতে থাকে। ডাইনী-শিকারী, অতি শ্রদ্ধেয়

খৃষ্টান কটন মাথের-এ ঘটনার সাক্ষী। এ বিষয়ে তদন্ত করে তিনি রিপোর্ট প্রকাশও করেছেন। ডাইনী-শিকারী হয়েও মাথের কিন্তু এ ব্যাপারটাকে ডাইনীর কাজ বলে উড়িয়ে দিতে পারলেন না। শুধু বললেন, প্রস্তরখণ্ডগুলো অতি "আস্তে" এসে মানুষকে আঘাত করছিল। কটন মাথের-এর পিতা ইনক্রীজ মাথের ভূত-তত্ত্ব নিয়ে বই লিখেছেন এবং ভূতে বিশ্বাস করতেন। তিনি গ্রানভিল-এর বন্ধু, পরস্পর পত্রযোগে আলাপ করতেন।

ইংলণ্ডেও এই সময় আর একটি বিশিষ্ট ভূতের গল্প চালু হয়। শিকারী হান্টার (Herne the hunter) একটি প্রেতাত্মা, ভৌতিক ঘোড়ায় চড়ে সে-উইনডসর বনের ভিতর দিয়ে বিদ্যুতবেগে ছুটে বেড়াত। হার্ন সপ্তদশ শতাব্দীর একজন বনরক্ষক। বনের একগাছে গলায় দড়ি দিয়ে সে আত্মহত্যা করে। পরে সেই বৃক্ষের নীচে বা নিকটবর্তী স্থানে তাকে দেখা যেতে লাগল। ভূতটি ক্ষতিকারক (malignant)---তার চক্ষু রক্তবর্ণ, মাথায় হরিণের শিং। যে তার দৃষ্টিপথে পড়ে সে অসুস্থ বা বিপন্ন হয়। এই সামান্য তত্ত্বের উপর গড়ে ওঠে বেশ একটা সুন্দর কাহিনী। সেকসপীয়ার "মেরী ওয়াইভস অব উইনডসর" এ 'হার্ন দি হান্টার'-এর কথা উল্লেখ করেছেন। সে এখনো বেঁচে আছে এবং গৃহপালিত জীবজন্তুর রোগাক্রান্ত হবার কারণ তার বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টি। তবে ইদানীং খবর পাওয়া যাচ্ছে তাকে আর যখন তখন দেখা যায় না। শুধু তার শিকারের শিঙ্গাধ্বনি ও ভৌতিক অশ্বের খট্‌খট্‌ খুরের আওয়াজ শোনা যায়। অতি সম্প্রতি তার আবির্ভাবের সঙ্গে আর একটি গল্প সংযুক্ত হয়েছে। তাকে দেখতে পাওয়া মানে রাজপরিবারে আসন্ন দুর্ভাগ্যের বা দেশের আকস্মিক বিপদের সুচনা।

উইনডসর ক্যাসেলে আর একটি ভুতুড়ে কাণ্ড ঘটে সপ্তদশ শতাব্দীতে। বর্মপরিহিত একটি মূর্তি আবির্ভূত হয়ে আসন্ন একটি মৃত্যুর খবর দেয়। এ ডিউক অব বাকিংহাম-এর প্রেতাত্মা।

রাজার পোশাক-পরিচ্ছদ তদারককারী পার্কার-এর সামনে ভূত উপস্থিত হয়ে তাকে বলে সে যেন ডিউকের ছেলে জর্জ ভিলিয়েরকে সাবধান করে ছ্যায়—সে আর বেশী দিন বাঁচবে না যদি সে তার চরিত্র না শোধরায় এবং সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন না করে। আরও দু'বার ভূত এসে পার্কারকে সতর্ক করে ছ্যায় এবং শেষবার হঠাৎ একখানি ছোরা বার করে বলে, "এই অস্ত্রে আমার ছেলের মৃত্যু অবধারিত।" ছ-মাস পরে হত্যাকারী ফেলটন-এর ছোরার আঘাতে ভিলিয়ারস-এর মৃত্যু হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর এই সত্যিকারের ভৌতিক কাহিনীর বর্ণনা ও ছবিসম্বলিত বিবরণী ঐ সময়েই মুদ্রিত হয়।

ঐ সময়ের আর একটি গল্প সবার জানা। কার্ডিনাল উলসির ভূত হঠাৎ আবির্ভূত হয় ক্যানটারবেরবীর আর্চবিশপের বিছানার পাশে ১৬৪১ সালের ১৪ই মে। কার্ডিনাল আর্চবিশপের সঙ্গে কথা বলেন এবং কিছু উপদেশ দান করেন।

এই আর্চবিশপের সমসাময়িক ছিলেন আর্ল অব স্টাফোর্ড। আর্ল-এর ভূত অনেকর সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় দেখা করে। রাজা প্রথম চার্লস এবং লণ্ডন টাওয়ারে আর্চবিশপ লর্ডের সঙ্গে সে সাক্ষাৎ করে আলাপ আলোচনা করে। ন্যাসবির যুদ্ধের পূর্বক্ষণে সে চার্লসকে সতর্ক করে দেয় পার্লামেন্টের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে লড়াই না করতে। চার্লস গ্রাহ্যি করলেন না এই অদ্ভুত (quaint) সতর্কবাণী, ফলে যুদ্ধে পরাজয় হল। লর্ডকে ভূত তিরস্কার করে বলেছিল, তার মন্দ স্বভাবের জন্য অবিলম্বে তার মস্তক ছিন্ন হবে। আর্ল-এর ভূতের কাষ্ঠনির্মিত মূর্তি ও ঘটনার বিবরণের পুস্তিকা ছাপানো হয়েছিল ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে।

ইংলণ্ডে গৃহযুদ্ধের আমলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। ক্রমওয়েলের গোঁড়া খৃষ্টান অনুচরদের ভীতিপ্রদর্শনার্থে রাজভক্তেরা নানাপ্রকার ভৌতিক গল্পের অবতারণা করেছিল। তন্মধ্যে নরফোক এর মিলারের কাহিনী বেশ উদ্দীপক। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে একদিন

মিলার (কলওয়ালা) জলের কল থেকে হাওয়ার কলের দিকে যাচ্ছিল। তখন ঝড় বইছিল। সে হঠাৎ দেখতে পেল তার সামনে কালোপোশাক পরা এক মূর্তি! সে কথা বলতে চেষ্টা করলে চোখের নিমেষে মূর্তিটি একটি কালো কুকুর হয়ে যায়। ফিরবার পথে আবার সেই কালো চেহারা। এবার কথা বলতে গেলে সে একটি কালো শূয়োর হয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়। অকস্‌ফোর্ড-এর বডলিয়ান লাইব্রেরীতে এ কাহিনীর হস্তলিখিত বিবরণী আছে। গোঁড়া খৃষ্টানরা এ সব গল্পে ভয় পেল। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে ভয়ঙ্কর একটি ঘটনা ঘটে উডস্টক প্যালেসে। এটা রাজবাড়ি। ক্রমওয়েল-এর অনুচরেরা এ প্রাসাদ অধিকার করে রাজকীয় সব চিহ্ন দূর করতে মনস্থ করল। প্রথম রাতে অনুচরেরা নির্বিঘ্নে নিদ্রা গেল। কিন্তু দ্বিতীয় রাত্রে রাজবাড়িতে তাণ্ডব শুরু হল। অদ্ভুত মূর্তি সব দেখা যেতে লাগল, একটা কুকুর-ভূত এসে বিছানা কামড়াতে থাকল, অদৃশ্য শক্তি এসে চেয়ার টেবিল আকাশে ছুঁড়তে লাগল, পরদা-গুলো টানাটানি আরম্ভ করল, বাতিগুলো কে বা কারা যেন হঠাৎ হঠাৎ নিবিয়ে দিল, সবশেষে কক্ষে কক্ষে গম্ভীর আওয়াজ শোনা গেল। অনুচরেরা প্রচণ্ড ভয়ে আতঙ্কিত হল। শুধু শার্ট গায়ে একজন ছোটাছুটি করার সময় তাকে ভূত মনে করে সহযোগীরা আর একটু হলে মেরে ফেলছিল আর কি! ফলে আতঙ্কিত বিমূঢ় কর্মচারীরা রাজপ্রাসাদ ছেড়ে পালাল, করণ তারা ভাবল নরকের সব শয়তান তাদের উপর চড়াও হয়েছে। রাজতন্ত্র (Restoration) পুনঃস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত প্রাসাদটিকে 'হানাবাড়ি' বলা হত। যোসেফ কলিনস্ ('Funny Joe') নামে একজন ধূর্ত ধড়িবাজ রাজবাড়ির কেরানী পরে স্বীকার করে যে সেই ভূতের নাচগানের স্রষ্টা—ক্রমওয়েল-এর অনুচরদের দূর করার জন্য ঐ উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভূত হচ্ছে স্মিথফিল্ড মার্কেট গোস্ট

(১৬৫৪)। ম্যালেট নামে একজন আইনবিশারদের প্রেতাত্মা প্রতি শনিবার রাত্রে নটা থেকে বারোটার মধ্যে মার্কেটে এসে হাজির হত আর মাংসের দোকান থেকে মাংসখণ্ড তুলে নিত। ভূতের মাথায় ও পায়ে লম্বা লম্বা শিং ও বাঁকা বাঁকা বিশাল নখ—মাংস তুলবার জন্য যা খুব উপযোগী। কসাইরা ছোরা ছুরি বঁটি দ্বারা ভূতকে আঘাত করতে গিয়ে দেখত অস্ত্রগুলো হাওয়ার ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছে। এ দুষ্ট ভূতটির কর্মক্ষেত্র ইস্ট চ্যাপেল ও ইস্ট চীপেও প্রসারিত ছিল। সেখানকার কসাইদের উপরও সমানে অত্যাচার হয়। রবীন গুডফেলো (Robin goodfellow—the fairy puck) কণ্ট্রি হাইডস (Country hides)-এর সঙ্গে এতটা দুষ্টুমী করতে পারেনি।

এ জাতীয় ভূতপ্রেতের সচিত্র জবর কাহিনী য়ুরোপে প্রচুর প্রচলিত ছিল। একটা মজার কাহিনী উল্লেখযোগ্য। জার্মানীর 'ভগ্ন পর্বত' নিয়ে যে ভৌতিক কাহিনী বেশ কিছু দিন চালু ছিল তা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। বহু শতাব্দী ধরে জার্মানীর হাৎস পর্বত ভূতপ্রেত দত্যিদানোর আবাসস্থল ছিল বলে মনে করা হত। হাৎস-এর সর্বোচ্চ শিখর 'ভগ্ন পর্বত' ('Broken Mountain') তেত্রিশ শ ফুট উঁচু—প্রতি বছর পয়লা মে এখানে ভূতের মেলা বসত। বছরের পর বছর লোকেরা শিখরে উঠেছে, এবং মেঘ পর্যন্ত উঁচু বিশাল বিশাল মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে গুস্তফ জর্ডন নামে এক ব্যক্তি উপরে উঠে সব দেখে শুনে ফিরে এসে বলে যে ভূতের কাহিনী অলীক। সে আবিষ্কার করল, যে ভূতের প্রকাণ্ড মূর্তি (মেঘ পর্যন্ত উঁচু) সামনে দেখা যাচ্ছে; সেটা তার নিজের ছায়া সূর্যালোকে মেঘের উপর প্রতিফলিত হচ্ছে। হায়, এমন একটা সুন্দর পৌরাণিক ভূতের কাহিনী এক দমকে মিলিয়ে গেল! জর্ডন-এর আবিষ্কার এনে দিল ভৌতিক কাণ্ডে অনুসন্ধানের এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী।

৩

ককলেন ভূত ও ব্যবহারিক বিবেচনা

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শিল্প ও বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে ভূত-প্রেত স্বভাবতই অদৃশ্য হতে থাকে, তাদের গল্প কেচ্ছাকাহিনী লোকে আর তেমন আমল দিত না। অনেক গল্প মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। কোনো কোনো ঘটনা মনুষ্যকৃত বলে ধরা পড়ে। দুষ্টু ছেলেরা গির্জার প্রাঙ্গণে কচ্ছপের পিঠে মোমবাতি জ্বালিয়ে ছেড়ে দিত, কচ্ছপ ধীরে ধীরে কবরগুলোর দিকে এগোত, এ দৃশ্যে স্বাভাবিকভাবে মানুষে ভয় পেত। কিন্তু এ সব ঘটনা সত্বেও মাঝে মাঝে কতকগুলি কাণ্ড ঘটেছিল বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না। সে সব ক্ষেত্রে ভূতের চরিত্র ও কারণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা শুরু হল।

বিখ্যাত ধর্মযাজক জন ওয়েসলী দুঃখ করে লিখেছেন (১৭৬৮) যে ডাইনী ও ভূতে অবিশ্বাস করা মানে বাইবেলকে তুচ্ছ করা। লিঙ্কশায়ারের এপওয়ার্থে—যেখানে তাঁর পিতা পুরোহিত ছিলেন সেখানে ১৭১৬ এবং ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে একটি ভূতের আবির্ভাব ঘটে কয়েকবার। তাঁরা সে ভূতের নাম দিয়েছিলেন 'বুড়ো জেফ্রি'। এটি পোলটার ভূত। ওয়েসলীর ছোট বোন হেট্টিকে নিদ্রিত অবস্থায় বিরক্ত করত, ঘরের মধ্যে গোলমাল আর্তনাদ করে বেড়াত। ওয়েসলী এ ভূতের অস্তিত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন এবং তার জার্নালে বিস্তৃতভাবে এর বিষয়ে লিখে রেখেছিলেন।

ওয়েসলীর পোলটার ভূতের মত বিখ্যাত হয়েছিল ককলেন এর ভূত (The cocklane ghost ১৭৬১)। অসংখ্য লেখক ও তদন্তকারীরা এ সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়েছিলেন। ককলেনে রিচার্ড পারসনস

নামে এক ভদ্রলোকের গৃহে ভূতটি সমগ্র পরিবারকে উৎপীড়িত করে, দরোজায় টোকা মারে, দেওয়াল আঁচড়ায়, বিশেষ করে গৃহস্থের কনিষ্ঠা কন্যা এলিজাবেথকে ভয় দেখায়। এলিজাবেথ বলেছিল 'হস্তহীন বস্ত্রাচ্ছাদিত মূর্তি' সে দেখতে পেয়েছে। তদানীন্তন লণ্ডনের প্রখ্যাত ব্যক্তিরা, ডক্টর জনসন, থেরেস ওয়ালপোল, অলিভার গোল্ডস্মিথ, ডিউক অব ইয়র্ক প্রভৃতি এ গৃহে এসে খোঁজখবর নেন। হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় ভীড় জমাত স্বচক্ষে ভূতের কাণ্ডকারখানা দেখবে বলে। অ্যানড্রু ল্যাং তাঁর "ককলেন অ্যাণ্ড কমনসেনস" (১৮৯৪) পুস্তকে লিখেছেন যে এই আশ্চর্য ঘটনা তাবৎ লণ্ডনবাসীকে উত্তেজিত করেছিল। বহু আলোচনা, বহু তর্কবিতর্ক, বহু পুস্তিকা লেখা হয়েছে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা নিয়ে। বুদ্ধির দ্বারা ব্যাখ্যা চলে না এমন অনেক কিছু তথ্য এ ব্যাপারে জড়িত আছে।

ককলেন এর পূর্বে গিলফোর্ড ভূত জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। গিলফোর্ডের ক্রিস্টোফার স্লটারফোর্ড তার প্রেমিকা জেন ইয়ংকে হত্যার অপরাধে ফাঁসীকাষ্ঠে জীবন দেয়। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে নিজেকে নিরপরাধ বলে ঘোষণা করতে থাকে। বিচারের সময় সাউথওয়ার্কে যে জেলখানায় সে ছিল সেখানে ভূত আনাগোনা করত। ঠিক মৃত্যুর আগে 'হোয়াইট লায়ন' নামে যে সরকারী ভবনে তাকে রাখা হয়েছিল সেখানে শৃঙ্খলের ঝনঝন শোনা যেতে লাগল। নিজের বাসস্থান গিলফোর্ডে তার প্রেতাত্মা ভয়ঙ্করভাবে আবির্ভূত হয়ে ভৃত্য যোসেফ ও বন্ধু রোজার ডলারকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মূর্তিতে দেখা দেয়—কখনো গলায় ফাঁসীর দড়ি, কখনো হাতে জ্বলত মশাল, কখনো হাতে লাঠি আর চিৎকার করতে থাকে "প্রতিশোধ", "প্রতিশোধ"। এদের দুজনের একজন কি তার ফাঁসীর জন্য দায়ী ?

১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে আর একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে বিচারালয়ে। একটি লোক হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হয়ে কোর্টে বিচারার্থে আনীত

হয়। তার বিরুদ্ধে প্রমাণের উপায় ছিল না। হঠাৎ আসামী দেখতে পায় সাক্ষী দিতে হাজির হয়েছে মৃত ব্যক্তি, গলায় কাটা দাগ। আসামীই গলা কেটেছিল। লোকটি এত ভয় পায় যে সে বিচারকের কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করে ও ফাঁসীতে মৃত্যু বরণ করে।

এই সময় কবন্ধ ভূতের কয়েকটি সত্য কাহিনী জানা যায়। লীডস্-এর কাছে ওয়টলীতে ঢিলে জামা পরা মাথাটা বগলের নীচে কবন্ধ প্রেত বছরে দু-একবার দেখা যেত। গৃহযুদ্ধের সময় ইয়র্কশায়ারের একজন অভিজাত ব্যক্তির প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। এ কবন্ধ তাঁরই প্রেতাত্মা। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের নিকটে একটি ছোট গ্রামে এক পুরোহিতের মস্তকহীন ভূত চলাফেরা করত। জীবিত অবস্থায় যাজক মহাশয় ডাইনীতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং লম্পট ছিল। সমসাময়িক একটি চিত্রে দেখা যায় অত্যাচারিতা দুটি মেয়ে কবন্ধকে দেখছে, আর কবন্ধ ভূত ডাইনীকে প্ররোচনা দিচ্ছে অন্য একটি মেয়েকে কুপথে নিয়ে যেতে। খৃষ্টান শহীদ সন্ত ডেনিস-এর কবন্ধও ঘুরে বেড়াত মস্তকটি সামনে নিয়ে, ফলে যারা অন্যায় করে তাঁকে হত্যা করেছে তাদের ভিতর শঙ্কার সৃষ্টি হত।

সার ওয়ালটার স্কট (১৭৭১-১৮৩২) লিখেছেন ("Letters on demonology and witchcraft") যে অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন সাহিত্যিকের সঙ্গে সদ্যমৃত এক বিশিষ্ট বন্ধুর প্রেতাত্মার সাক্ষাৎ হয়। স্কটের কাছে বসে ভদ্রলোকটি কবিতাপাঠ করছিলেন। হঠাৎ ভূত এসে তাঁর সামনে উপস্থিত। ভদ্রলোক তো ভয়ে অজ্ঞান। সুস্থ হবার পূর্বেই প্রেতাত্মা অন্তর্হিত হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ বিশ্বাসযোগ্য ভূত এসেছিল চরিত্রহীন লর্ড টমাস লিটলটন-এর সামনে তাঁর মৃত্যুর কিছু পূর্বে। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর রাতে যখন লর্ড নিদ্রিত আছেন তখন পাখীর ডানা ঝাপটানর শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। তিনি চোখ

মেলে দেখেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে সেই মহিলাটি যাকে তিনি বিপথ-গামিনী করেছিলেন এবং যিনি মনের দুঃখে পরে আত্মহত্যা করেন। প্রেতাত্মা দেওয়ালের ঘড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তাকে সাবধান করে দিয়ে বলে যে তিনদিন পর ঠিক এই মুহূর্তে তাঁর মৃত্যু অবধারিত। লর্ড ভীত হলেন, বন্ধুরা ভরসা দিয়ে গোপনে ঘড়ির সময় একঘণ্টা এগিয়ে দিল। তৃতীয় রাত্রে সময় চলে গেল। লর্ড খুশী হয়ে ঘুমোতে গেলেন। নিকটবর্তী গির্জার ঘড়িতে ঠিক সময় বেজে উঠল, লর্ড ভৃত্যের কোলে ঢলে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হল তাঁর। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা অবলম্বনে একটি বিশ্বস্ত আশ্চর্যজনক ছবি আঁকা হয়। ভৃত্যের কাছ থেকে চিত্রকর খুঁটিনাটি সব খবর জেনে নিয়েছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে আমেরিকায় প্রমাণসিদ্ধ ভূতের ঘটনা ঘটতে থাকে। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এক স্পিরিট-এর খবর মেলে, তার কথাবার্তা শোনা যায়, কিন্তু চোখে দেখা যায়নি ("heard, but not seen")। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই—

মেজর ব্লমবার্গ শত্রু আক্রমণ করতে বাইরে গেছে। দুজন সহকর্মী ব্রিটিশ অফিসার তার জন্য অপেক্ষা করছে ক্যাম্পে। কিন্তু তার কোন পাত্তা নেই। হঠাৎ ক্যাম্পের বাইরে পরিচিত পদশব্দ শোনা গেল। পদশব্দকারী ভিতরে না এসে বাইরে থেকে একজনকে উদ্দেশ করে জানাল যে সে যখন ইংলণ্ডে ফিরবে তখন ওয়েস্টমিনিস্টার এর কোন বিশেষ বাড়িতে যাবে। সেখানে এক ঘরে (ঘরের বিস্তৃত বিবরণ কণ্ঠস্বর দিয়েছিল) মেজরের দশ বছরের ছেলের জন্য বিশেষ দরকারী জরুরী কাগজপত্র আছে সেগুলি সে যেন সংগ্রহ করে। পদশব্দ তারপর ফিরে চলতে চলতে অদৃশ্য হল। অফিসার দুজন বিস্ময়ে অবাক। পরমুহূর্তে দৌড়ে বাইরে এসে দেখল কেউ কোথাও নেই। শিবিরের প্রহরী জানাল সে কাউকে দেখেনি বা কোন কথা

শোনেনি। অবিলম্বে দেখা গেল একদল সৈন্য বন থেকে বেরোচ্ছে একটি মৃতদেহ বহন করে। মৃতদেহ মেজর ব্রমবার্গের। ঠিক দশ মিনিট পূর্বে সে নিহত হয়েছে। সহজে বোঝা গেল যে মুহূর্তে শত্রু কর্তৃক মেজর নিহত হয়েছিল সেই সময়ই তাঁর প্রেতাত্মা শিবিরে এসে বন্ধুদ্বয়ের সঙ্গে কথা বলে।

এই অদ্ভুত ঘটনাটি এখানেই শেষ হয়নি। বন্ধুটি ইংলণ্ডে গিয়ে উল্লিখিত গৃহে "জরুরী" কাগজপত্র পায়, সেগুলি মেজরের পুত্রের নামে ইয়র্কশায়ারের সম্পত্তির মালিকানাসংক্রান্ত উইল। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে এ ঘটনা নিয়ে তুমুল আন্দোলন হল। রাণী শার্লোটি নাবালক ছেলেটিকে রাজকীয় নার্সারিতে এনে চিত্রকর গেনসবরো কর্তৃক তার একটি ছবি আঁকান। ছবিটি মেজরের প্রেতাত্মার স্মৃতি হিসাবে রক্ষিত হল।

উত্তর আমেরিকার দ্বিতীয় গল্পটির বর্ণনা দিয়েছেন মার্কিন রাজনীতিবিদ রবার্ট ওয়েল সত্যিকারের ভূতের কাহিনী বলে। কেপ ব্রিটন দ্বীপে ১৭৮৫ সালের অক্টোবর মাসের ঘটনা। দুজন তরুণ সৈন্য, শেরব্রুক ও উইলইয়ার্ড (পরে স্যার জন শেরব্রুক ও জেনারাল জন উইলইয়ার্ড) এক রাতে ঘরে বসে পড়াশুনা করছিলেন। হঠাৎ গভীর রাতে বিশ বছর বয়সের একটি দীর্ঘকায় যুবক তাদের সামনে উপস্থিত হয়। যুবকটি অত্যন্ত শীর্ণকায়, সামান্য পোশাক পরিধানে (প্রচণ্ড শীত সত্ত্বেও)। শেরব্রুক পরে লিখেছেন যে উইলইয়ার্ড ভয়ে মৃতের মত বিবর্ণ হন। মূর্তিটি দরোজা দিয়ে বেরিয়ে গেল কিছুক্ষণ পরে। উইলইয়ার্ড বলে উঠলেন, "আরে, এ যে আমার ভাই!" কিন্তু ভাই তো তখন ইংলণ্ডে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কিছু কিনারা হল না। পরে ইংলণ্ডে চিঠি লেখা হল। জবাবে জানা গেল যে মুহূর্তে সেদিন ভাই ক্যানাডায় দাদার সামনে এসেছিল, সেই মুহূর্তেই লণ্ডনে তার মৃত্যু হয়। শেরব্রুক ও উইলইয়ার্ড তারপর বরাবর দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করে বলেছেন যে তাঁরা সে রাত্রে মৃতের প্রেতাত্মাই দেখেছেন।

তৃতীয় ভূতটি একটি পোলটার। নিউ ইয়র্ক-এর নিউ হ্যাভারসাকে ১৭৮৯ সালে ডাক্তার থর্ন-এর বাড়িতে এর উৎপাত আরম্ভ হয়। দরোজা জানালায় হঠাৎ হঠাৎ খট্‌খট্‌ শব্দ হয়। নানা জিনিস বাড়ির চারদিকে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। মার্চ মাস থেকে কয়েক মাস ধরে এ উপদ্রব চলতে থাকে। কয়েকজন যাজক ও ধার্মিক ব্যক্তি এ বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত করে কোনো কিনারা করতে পারেন না। গৃহের একটি পরিচারিকার ঘরে দুপুর রাতে শ্বেতবস্ত্র-পরিহিতা একটি মূর্তি আকস্মিকভাবে হাজির হয়। এই শেষোক্ত ঘটনা নিয়ে একটি সুন্দর নাটকীয় ছবিও আঁকা হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে য়ুরোপে নানা দেশে ভূতের দর্শন মিলতে থাকে। ১৭২১ সালে প্রখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ প্রফেসর সুপার্টের গৃহে গ্রোচেনে পোলটার-এর উপদ্রব শুরু হয়। দশ পাউণ্ড ওজনের পাথর ঘরে নিক্ষিপ্ত হয়, জিনিসপত্র ছোঁড়াছুঁড়ি আরম্ভ হয়। প্রফেসর মাসখানেক ধরে ঘুমাতে বা পোশাকপরিচ্ছদ বদলাতে পারেননি। ভূত তাঁর পত্নীকে কামড়ে দেয়, চিমটি কাটে ও ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। নিরুপায় সুপার্ট অনেককে তাঁর ঘরে ডেকে নেন এ ঘটনার সাক্ষী হতে। অন্তত ডজন খানেক সাক্ষী দেখতে পেল যে "অদৃশ্য কেউ এসে প্রফেসরকে আক্রমণ করে আহত করে গেল।"

১৭৩২ সালে ফ্রান্সে দুপরিয়ে নামে একজন-এর ঘরে ও দোকানে সন্ত মেদার্দে একটি দুষ্ট প্রেতাত্মার উৎপাত শুরু হয়। লোকেরা এসে দেখল ঘরের ভিতরে ও বাইরে অনেক প্রস্তরখণ্ড নিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে। কী করে পাথর এল, কে ফেলল তার কোন হদিস পাওয়া গেল না। ১৭৪৬ সালে আমিয়েনসে ঐ একই ঘটনা ঘটে চোদ্দ বছর ধরে—দীর্ঘতম সময়ের জন্য পোলটার এর অত্যাচারের ঘটনা এটি। গোলমাল হৈচৈ শোনা যেত কখনো কখনো, পাথর এসে পড়ছে দেখা যেত। অনেকে এ ঘটনার সাক্ষী, ফাদার শার্লে

রিশার তন্মধ্যে একজন।

সুইডেন ও রাশিয়ায় অনেক কৌতূহলজনক প্রেতাত্মার গল্প শোনা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে সুইডেনের ছোট্ট শহর হিয়ালটা-স্টাড-এ ভয়ঙ্কর এক ডেভিলের আবির্ভাব হয়, ভয়ে মানুষেরা শহর ছেড়ে পালায়। রাশিয়ার এক মঠে ঘণ্টা বাজানে-ওয়ালা এক প্রেতাত্মা আসে ১৭৫৩ সালে। রোজারা পুরোহিতেরা সে ভূতকে তাড়াতে পারেনি। এক বছর ধরে সে মঠবাসীদের জীবন দুবিসহ করে তুলেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে বৈজ্ঞানিকেরা ও পণ্ডিতজনেরা প্রেত-তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। তাঁরা স্থির সিদ্ধান্তে এলেন যে কতকগুলি ভৌতিক কাণ্ডের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা চলে। কিছু কিছু ঘটনা দুষ্ট লোকের চাতুরী বা আলোর খেলা। ডাক্তার জেমস অ্যাণ্ডারসন তো ঘোষণাই করলেন যে সব ভূতের গল্পই অলীক ও মিথ্যা (১৭৯১)। তিনি দেখলেন যে মাতালেরাই ভূত দেখে আর বাতরোগাক্রান্তা বৃদ্ধারা প্রেতাত্মা কর্তৃক উপদ্রুতা হয়। কিন্তু প্রফেসর হুভল্যাণ্ড বলেন বার্লিন-এর পুস্তকবিক্রেতা নিকোলাই ইচ্ছামতো ভূতের আগমন ঘটাতে পারেন। প্রফেসর নিজে দু-মাস ধরে মানুষের ও জীবজন্তুর প্রেতাত্মা দেখেছেন, এমন কি তাদের কণ্ঠস্বর অবধি শুনেছেন। তিনি জীবিত বা মৃত পরিচিত ব্যক্তিদের ভূত দেখেছেন, কথাবার্তা বলেছেন, তারা প্রেতাত্মা জেনেও। ভূতগুলির চেহারা রক্তহীন, বিবর্ণ ("paler then in nature")। ভূত সম্বন্ধে তৃতীয় গবেষণাকারী স্কটিশ ডাক্তার জন এবারক্রমবি মনে করেন দৃঢ় মানসিক শক্তির জোরে ভৌতিক আত্মার উপলব্ধি করা যায়। এবারক্রমবি এবং আরো অনেকে বিশ্বাস করেন যে অত্যন্ত অপ্রস্তুত অবস্থায় প্রেতাত্মা দেখা যায়। গভীর রাত্রের অন্ধকারে মানুষের মন অপচ্ছায়া দর্শনে মানসিকভাবে তৈরী থাকে। গভীর রাতের নির্জনতায় একজন

লোকই প্রেতাত্মা দেখে (সাধারণত দু-তিনজন একসঙ্গে দেখে না) মানসিক একাগ্রতার ফলে।

কিন্তু এই সব বৈজ্ঞানিক ও সন্দেহবাদীদের মতামতের ফলেও ভূতের অস্তিত্ব যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে এবং তা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর গবেষণা এ বিষয়ে অনেক নতুন আলোকপাত করেছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু ভূতপ্রেতের আবির্ভাব এখনো ঘটছে--মানুষ কখনো কখনো ভূত দর্শনে হকচকিয়ে যাচ্ছে, কখনো বা তাদের বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে।

৬

ভৌতির প্রদর্শনী, ভৌতিক জাহাজ, প্রেতবাদের জন্ম

কৃত্রিম উপায়ে ভূতপ্রেত সৃষ্টির ইতিহাস রোমান যুগ থেকে চলে আসছে। কিন্তু ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসী সাংবাদিক আরমন্দ পুলতিয়ে ভূত প্রদর্শনীর যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অসাধারণ ও ভয়ঙ্কর। য়ুরোপে জনতাকে হতবুদ্ধি ও চমকিত করে ভূত প্রদর্শনীকে শিল্পে পরিণত করেছিলেন একজন বেলজিয়ান দৃষ্টিবিজ্ঞানী, ই. জি. রবার্টসন। ফরাসী রিভলিউশনের ঠিক পরেই প্যারিসে এসে তিনি প্রস্তাব দেন যে জ্বলন্ত কাচের সাহায্যে তিনি ফরাসী বন্দর অবরোধকারী ব্রিটিশ জাহাজগুলিকে আগুনে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দিতে সক্ষম। অবশ্য তৎকালীন সরকার তাঁর এ অভিনব প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। কিন্তু রবার্টসন তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি এবং আলোকবিজ্ঞানের জ্ঞানের সাহায্যে ভূত-প্রেতের বায়বীয় মূর্তি সৃষ্টি করে মানুষকে খুশী, বিস্মিত, চমৎকৃত ও আতঙ্কিত করতে সক্ষম হলেন। পুলতিয়ে লিখেছেন "Robertson calls forth phantoms and commands legions of spectres." রবার্টসন এর "Phantasmagoria প্রদর্শনীতে অজস্র লোকের সঙ্গে পুলতিয়েও উপস্থিত ছিলেন। ম্যাজিসিয়ানের মত ঘনকৃষ্ণ পোশাক পরে রবার্টসন ডাইনী বিদ্যা, ম্যাজিক, প্রেতাত্মা প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করে "কে কার ভূত দেখতে চান?" বলে জনতাকে আহ্বান করেন। একজন বলে উঠল, "আমি মারাকে (Marat, ১৭৪৩-৯৩, রেভলিশন-নেতা, "ফ্রেণ্ড অব দি পিপল," শার্লোটি কর্দে তাঁকে হত্যা করেন) দেখতে চাই।" রবার্টসন তৎক্ষণাৎ একটি জ্বলন্ত কয়লার পাত্রে দু গ্রাম রক্ত, এক বোতল সালফিউরিক অ্যাসিড, কয়েক ফোঁটা নাইট্রিক অ্যাসিড, "স্বাধীন

মানবের জার্মান”-এর দুটি সংখ্যা ফেলে দিলেন। দ্রব্যগুলি একসঙ্গে জ্বলে ওঠায় প্রচুর ধোঁয়ার সৃষ্টি হল আর অকস্মাৎ দেখা গেল ধোঁয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটি ভয়ঙ্কর বিবর্ণ প্রেতমূর্তি, তার কোমরে ছোরা, মাথায় স্বাধীনতার লাল টুপি। যে লোকটি মারাকে দেখতে চেয়েছিল সে চিনতে পেরে দ্রুত এগিয়ে মূর্তিটিকে আলিঙ্গন করতে প্রয়াস পেল। প্রেতটি বিকট মুখভঙ্গী করে হঠাৎ অদৃশ্য হল। একজন যুবক তার সদ্য-মৃতা প্রিয়তমাকে দেখতে চাইল এবং সে মহিলার প্রতিকৃতি রবার্টসনকে দেখাল। রবার্টসন এবার জ্বলন্ত পাত্রে ফেললেন কতকগুলি চড়ুই পাখীর পালক, দু-এক টুকরো ফসফোরাস এবং গোটা বারো প্রজাপতি। দেখতে দেখতে ধোঁয়ার মধ্যে দৃষ্ট হল উন্মুক্তবক্ষা আলুলায়িতকুন্তলা অপরূপ রূপসী এক মহিলা। মহিলাটি যুবকের দিকে মিষ্টি হাসি হাসলেন। পুলতিয়েব পাশে বসা একজন গম্ভীরবদন ভদ্রলোক হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, “হা ঈশ্বর, এ যে আমার স্ত্রী, আবার সে বেঁচে উঠেছে।” তারপর ভীত হয়ে সে ছুটে পালাল সত্যিসত্যি তার পত্নী এসেছে মনে করে।

রবাটসন ভূতপ্রেত নিয়ে কারবার করেন বলে পুলিস তাঁর প্রদর্শনী বন্ধ করতে চাইল। অদম্য রবার্টসন নতুন প্রশস্ত জায়গা খুঁজে নিলেন তাঁর শো-এর জন্য। জায়গাটি বেশ মানানসই ও উপযুক্ত: একটি পরিত্যক্ত গির্জা, কবর ও স্মৃতিস্তম্ভে ও ফলকে ভর্তি। সমস্ত জায়গাটা কালো আবরণে ঢেকে অ্যালকোহল ও নুন মিশিয়ে প্রদীপ জ্বাললেন। সে প্রদীপের ছায়াতে অগণিত দর্শকের মুখ মৃতের মুখের ন্যায় দেখাচ্ছিল। প্রথমে বক্তৃতা, পরে হঠাৎ গাঢ় অন্ধকারে মঞ্চ ডুবে গেল, শুরু হল ঝড়, বৃষ্টি, বজ্র ও বিদ্যুতের ঝর-ঝরানি, কড়কড়ানি ও ঝলকানি। পরমুহূর্তে শোনা গেল অরগানের ভাবগম্ভীর সুর। হঠাৎ দেখা গেল ভলতেয়ার, মিরাবো, রুশো, রোবসপিয়ের, দাঁতঁ প্রভৃতি প্রখ্যাত ফরাসী নেতৃবৃন্দের প্রেতাত্মারা

ধীরে ধীরে সার বেঁধে এসে দাঁড়াল। কিছু পরে পাতলা হাওয়ায় অদৃশ্য হয়ে গেল। রোবসপিয়ের-এর ভূত কবর থেকে উঠছে দেখা গেল। আকাশ থেকে বিদ্যুতের ভয়ানক ঝলকানি এসে ছায়া ভূতদের এক এক জনকে আঘাত করত আর তারা মাটিতে মিশে চক্ষুর অগোচর হয়ে যেত। এ প্রদর্শনীতে দর্শকবৃন্দের অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করে ছুটে পালাতেন। বেশীর ভাগ মেয়েরা তো জ্ঞানহারা হয়ে মাটিতে লোটাতেন। ঐ সময়ে রবার্টসন আনীত ভূতে সবাই বিশ্বাস করতেন। কয়েক বছর পর তাঁর গুপ্ত উপায়-গুলির তথ্য প্রকাশ করা হয়। কনকেভ মিরর, কনভেকস লেনস, লুক্কায়িত সহকারীরা ও সাহায্যকারী বস্তুর কাহিনী তিনি নিজেই জনসমক্ষে জানান।

রবর্টসন-এর নকল করে এবং তাঁর প্রণালীর কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়ে "Phantascope" য়ুরোপে অনেক প্রদর্শনী পরে দেখান হয়েছে। রবার্টসন-এর "ভূত তৈরীর যন্ত্রের" কাহিনী ভিত্তি করে প্রখ্যাত জার্মান কবি শিলার (Schiller, 1759-1805) তাঁর "The ghost-seer" উপন্যাস ভূতযন্ত্র তৈরী বিষয়ে লিখেছেন। ডিকেন্স (Dickens, 1812-70) এর "কৃসমাস ক্যারল" ও "দি হন্টেড ম্যান", বুলওয়ার লিটন (Bulwar lylton, 1803-73) এর "ষ্ট্রেঞ্জ স্টোরি" প্রভৃতি গ্রন্থে এ ঘটনার উল্লেখ আছে।

কিন্তু সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভূত প্রদর্শনী হয়েছিল লণ্ডনে উনবিংশ শতাব্দীতে। প্রদর্শক প্রফেসার হেনরী পিপার (Pepper, 1863) এখানে ভূতকে আকাশে চলমান অপচ্ছায়া রূপে দেখানো হয়। আয়না ও ম্যাজিক লণ্ঠন ব্যবহার না করে তিনি বড় একখানা সাদা গ্লাস কাজে লাগান। তাঁর কৌশল পরে এক প্রবন্ধে তিনি প্রকাশ করেন। পিপারকে অনেকে নকল করেন, কিন্তু ফরাসী ঐন্দ্রজালিক রবাঁ (Robin) ব্রাসেলস্, ভিয়েনা, রোম মিউনিক ও ভেনিসে বিপুল জনসমাগমে তাঁর ভৌতিক প্রদর্শনী দেখিয়ে প্রভূত উত্তেজনার

সৃষ্টি করেন। তাঁর প্রদর্শনীতে কবর থেকে উঠে আসা ভূত জীবিত মানুষকে আলিঙ্গন করে, ভূতেরা গায়কদের বিদ্রূপ করে, প্রাচ্যদেশের প্রেতাত্মারা জীবিত লোকের সঙ্গে তরবারী নিয়ে লড়াই করে।

এ শতাব্দীর শেষের দিকে ম্যাজিক লণ্ঠন ক্যামেরায় পরিবর্তিত হয়ে ভূতপ্রেত দেখতে শুরু করে নতুন কায়দায়। এবার সূত্রপাত হল "স্পিরিট ফোটোগ্রাফের"।

এই কৃত্রিম বায়বীয় প্রেতমূর্তি দেখানোর সময় কিন্তু সত্যি কারের ভূত-এর আনাগোনা বন্ধ হয়নি। ১৮০৪ সালে লণ্ডনে একটি ভূত তোলপাড় করে তুলেছিল শহর জীবনকে। এর নাম "হ্যামারস্মিথ ভূত"। সন্ধ্যার পর কেউ হ্যামারস্মিথ জেলার পথে বেরোত না। এ প্রথম দর্শন দেয় একটি মহিলাকে, যখন মহিলাটি গভীর রাতে স্থানীয় গির্জাপ্রাঙ্গণ অতিক্রম করছিলেন। সমাধি-স্তম্ভের পিছন থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসে একটি দীর্ঘমূর্তি। মহিলা ভয়ে দৌড় দিলেন, কিন্তু ভূতটি তাকে দু হাতে বেড় দিয়ে ধরে ফেললে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। পরে তাঁকে সেখানে পাওয়া যায় এবং ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু মহিলাটি এত আতঙ্কিত হয়েছিলেন যে কয়েকদিনের মধ্যে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরে এই প্রেতাত্মাকে দেখতে পায় ষোলজন মালবাহী গাড়ির আরোহী। তারা দ্রুতবেগে ছুটে পালায়। আরো দুবার গভীর রাত্রে লোকরা একে দেখে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তখন তদন্ত করান এবং জানা যায় ভূতটি একটি যুবকের প্রেতাত্মা; সে স্বহস্তে নিজের গলা কেটেছিল। কিন্তু কোন ব্যক্তি সাহস করে ভূতের সঙ্গে দেখা করতে রাজী হয়নি। কিন্তু এই প্রেতাত্মাকে ধরতে গিয়ে একটি শোকাবহ ঘটনা ঘটে। একদল সাহসী লোক কবরখানায় পাহারারত থাকে। তৃতীয় রাতে তারা দেখতে পায় শ্বেতবস্ত্র পরিহিত কে একজন তাদের দিকে আসছে। স্মিথ নামে একজন শুল্ক আফসার এগিয়ে গিয়ে তাকে গুলি করে। হতভাগ্য ব্যক্তি ধুলোয় গড়িয়ে পড়ে, আর ওঠে না।

সে টমাস উড, একজন রাজমিস্ত্রী, গভীর রাতে কাজ করে ফিরছিল। ভূতটিকে পাওয়া যায় না। এখনো সে বর্তমান।

আরো বহু ভূতের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল ঐ সময়। সে সবের বিবরণমূলক পুস্তিকা ও কাগজপত্র এখনো আছে। লিপিবদ্ধ ঘটনা সমূহের মধ্যে সবচেয়ে অসাধারণ হচ্ছে কঙ্কাল কোণ (Skeleton corner)-এর রহস্যময় গৃহ (Mysterious house)। এই ঘরে অনেক ভূতেরা বসবাস করত (১৮২০)। ব্লাকফ্রায়ারস-এর স্টামফোর্ড স্ট্রীটের এ বাড়িটি পুরোনো ও ভগ্ন। বৃদ্ধা মালিক গৃহটিকে সংস্কার করতেন না। স্বভাবত লোকেরা এটাকে 'হানাবাড়ি' বলত। কিন্তু ১৮২০ সালে ভগ্নবাড়ির জানলায় জানলায় অস্পষ্ট সব মূর্তি দেখা যেতে লাগল। প্রথমে দেখা গেল শ্বেতবস্ত্রাবৃতা একজন নারীকে। এ খবর ছড়াতে না ছড়াতে দ্বিতীয় মূর্তির আবির্ভাব হল—খুনীর মত ভয়ঙ্কর চেহারা, এক হাতে ক্ষুর, অপর হাতে একটি নারীর মুণ্ড রুমালে জড়ানো, মূর্তিটি যেন পলায়নোদ্যত। ক্রমশ আরো অপচ্ছায়া ও কঙ্কালের আগমন হতে থাকল। গল্প ছড়িয়ে পড়ল—রুটিওয়ালার ঠেলাগাড়ি থেকে অদৃশ্য হস্ত রুটি তুলে নিচ্ছে, কসাই ও কেকওয়ালার গাড়ি থেকে তাদের জিনিস কে যেন নিয়ে নিচ্ছে, যখন তারা বিশ্রাম করবার জন্য বাড়ির সামনে থামে। কেউ কেউ মনে করলেন ভব-ঘুরের দল ও বাড়িতে আড্ডা গেড়ে এই সব উপদ্রব চালাচ্ছে। কিন্তু তদন্ত করে কোন প্রমাণ মেলেনি। বহুদূর থেকে লোকেরা আসত বাড়িটি দেখতে। ফলে ভূতের গল্প দিনে দিনে বেড়ে চলল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বাড়িটি ভেঙ্গে ফেলা হয় একটি ব্যাঙ্কের জন্য। সে সময় পর্যন্ত ভূতের উপস্থিতি অনুভূত হত সে গৃহে।

হ্যাম্পটন কোর্ট প্রাসাদের ভূত নিয়ে বেশ তর্কবিতর্ক হয়েছিল এক সময়। হতভাগিনী জেন সিমোর (১৫১০-৩৭) ও ক্যাথারিন হাওয়ার্ড (মৃত্যু ১৫৪২) (অষ্টম হেনরীর তৃতীয় ও পঞ্চম পত্নী)-এর অস্থির প্রেতাত্মা প্রাসাদের বারান্দায় ও বাগানে চলাফেরা করত।

ষষ্ঠ এর্ডওয়াডের নার্স মিসট্রেস পেন এর প্রেতাত্মাকে অনেকেই দেখেছে প্রাসাদে ঘুরে বেড়াতে। ১৫৬২ সালের নভেম্বর ৬ তারিখে বসন্তরোগে পেন মারা যান (ঐ সময়ে রানী এলিজাবেথও ঐ রোগে ভুগছিলেন)। প্রাসাদ-সংলগ্ন হ্যাম্পটন চার্চে তার দেহ সমাহিত হয়। ১৮২৯ সালে চার্চ ভেঙে ফেলা হয় এবং তার দেহাবশেষ চারিদিকে ছিটকে ছড়িয়ে পড়ে। তারপরেই যে ঘরে পেন বাস করত সে ঘরে অদ্ভুত গোলমাল ও কথাবার্তা শোনা যেতে থাকে। ভদ্রমহিলাকেও দেখা যায়—দীর্ঘ, শীর্ণ, ধূসর বর্ণের ঝোলানো পোশাক পরা, হাত দুখানি সামনে প্রসারিত আবেদনের ভঙ্গীতে। সেই সময় থেকে প্রাসাদের বহু লোক তাকে দেখে আতঙ্কিত হয়েছে। এমন কি ১৮৮১ সালে একজন সান্ত্রী দেখে যে পেন-এর প্রেতাত্মা দেওয়ালের ভিতর দিয়ে সোজা চলে গেল। সে ভয় পেয়ে সবাইকে খবর দেয়। শতাব্দীর শেষের দিকে একজন শিল্পী স্বচক্ষে প্রেতাত্মাকে দেখে এবং সঙ্গে সঙ্গে কলম ও কালির সাহায্যে একটি ছবি আঁকে। সে স্কেচটি এখনো আছে।

আর একটি কাহিনী এখানে উল্লেখোনীয়। সাফোক জেলার বিলিংস গ্রামে মেজর এডওয়ার্ড মুর-এর রান্নাঘরে কয়েকটি ঘণ্টা ঝুলানো ছিল ভৃত্যদের ডাকবার জন্য। মুর পণ্ডিত ব্যক্তি; রয়েল সোসাইটির ফেলো। ২রা ফেব্রুয়ারী থেকে ২৭শে মার্চ পর্যন্ত (১৮৩৪) চুয়ান্ন দিন ধরে ঘণ্টাগুলি যখন-তখন বাজতে থাকে, কোনো লোক কাছে না থাকলেও। জোর তদন্ত ও অনুসন্ধান চলল। বহু দর্শকেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন ঘণ্টাগুলি আপনা আপনি দুলছে ও আওয়াজ আসছে। এ যে ভূতের কীর্তি সে বিষয়ে কারো সন্দেহ থাকল না। তারপর একদিন নিজে নিজে ঘণ্টা বাজানো বন্ধ হল। আজ অবধি এ ভৌতিক ঘণ্টার গোপন তত্ত্ব জানা যায়নি।

ভৌতিক জাহাজ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ভৌতিক জাহাজ (Phantom ship) সম্বন্ধে লেখক ও শিল্পীরা আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৮৪০ সালের শুরুতেই বিখ্যাত ভৌতিক জাহাজ 'ফ্লাইয়িং ডাচম্যান' ('Flying dutchman')-এর কাহিনী নিয়ে অগস্ত জাল (Scenes de la vie maritime, 1832) হাইনরিখ হাইনে (প্রবন্ধ, ১৮৩৪), ক্যাপ্টেন ম্যারিয়ট ("ফ্যানটম শিপ", ১৮৩৯) এবং রিখার্ট ভাগনার ("ফ্যানটম শিপ অপেরা", ১৮৩৪) প্রভৃতি, বিশেষ করে ভাগনারের "অপেরা", ভৌতিক জাহাজের কাহিনীকে অমর করে রেখেছে। সেই সময় থেকে "The phantom sailor become a part of popular mithology." কাহিনীর মূল ঘটনা এই :— একজন ডাচ ক্যাপ্টেন উত্তমাশা অন্তরীপ পেরোতে গিয়ে প্রচণ্ড ঝড়ে পড়ে, নাবিকদের আবেদন সে অগ্রাহ্য করে, এমন কি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকেও সে তুচ্ছ করে জাহাজ চালিয়ে দেয়। ঈশ্বর অবিশ্বাসের জন্য তার শাস্তি হয়—ভূতুড়ে জাহাজে সে আজীবন ঘুরে বেড়াবে, অন্যান্য জাহাজ ও নাবিকদের ধ্বংস হতে প্রলুব্ধ করবে। ক্যাপ্টেন পরে অনুতপ্ত হলেও নাবিকেরা ততোদিনে কঙ্কালে পরিণত হয়েছে এবং তার কথা আর মান্য করেনি।

অন্যান্য জাহাজের বহু নাবিক এই "ফ্লাইয়িং ডাচম্যান'-কে সমুদ্রে নানা স্থানে দেখতে পেয়েছে। প্রিন্স জর্জ (পরে সম্রাট পঞ্চম জর্জ) ১৮৮১ সালের ১১ই জুলাই অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ তীরে এই ভৌতিক জাহাজকে দেখতে পান। তখন জর্জ "ইনকনসট্যানট" জাহাজে ক্যাডেট ছিলেন। তিনি জাহাজের লগবুকে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন যা লণ্ডনের অ্যাডমিরালটিতে রক্ষিত আছে। "The flying

dutchman" crossed our bows. She emitted a strange phosphorescent light as of a phantom ship all aglow, in the midst of witch light the masts, spars and sails of a brig 2oo yds distant stood out in strong relief as she came up on the portbow. কিন্তু কিছুক্ষণ পরে 'no vestige nor any sign whatever of any material ship was to be seen either near or right away to the horizon, the night (at 4 A. M.) beeing clear and the sea calm.' প্রিন্স বলেছেন তাঁর জাহাজের তের জন নাবিক ফ্যানটম শিপকে দেখেছে। কিন্তু হঠাৎ জাহাজের একজন তরুণ নাবিক ও স্বয়ং অ্যাডমিরাল কিছুদিন পর মারা যান। এ কি ভৌতিক জাহাজের কীর্তি ?

ভূতুড়ে জাহাজের গল্প ইংলণ্ড, জার্মানী, স্কান্দিনেভিয়া, আমেরিকা এমন কি চীনদেশেও প্রচলিত আছে। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা আবিষ্কার করেছেন প্রায় একই ধাঁচের অনেক জনপ্রিয় কাহিনী এই সব দেশের ভাণ্ডার থেকে।

বর্তমান যুগের একটি খুব ইনটারেসটিং গল্প পাওয়া যায় উত্তর আমেরিকার তীরে। "প্যালাটিন" নামে একখানা ডাচ জাহাজ ১৭৫২ সালে আমেরিকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে রোদ আইল্যাণ্ডের কাছে ঝড়ে পড়ে। কাপ্তেন মারা যায়। নাবিকেরা জাহাজ লুটপাট করে লাইফবোট চড়ে সরে পড়ে যাত্রীদের জাহাজে ফেলে। জাহাজ-খানা ভাসতে ভাসতে ব্লক আইল্যাণ্ডে আটকা পড়ে। দ্বীপবাসীরা আরোহীদের নামতে দেয় এবং জাহাজ লুট করে। পরে জাহাজে আগুন লাগিয়ে ভাসিয়ে দেয়। একজন আরোহী জাহাজ থেকে নামতে চায়নি। তাকে নিয়ে জ্বলন্ত জাহাজ দিকচক্রবালে অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রতি বছর ঐ দিনে জ্বলন্ত জাহাজখানিকে ব্লক দ্বীপের কাছ দিয়ে ভেসে ভেসে চলতে দেখে লোকেরা আজও।

ভৌতিক জাহাজ সম্বন্ধে অনেক বিশ্বাসযোগ্য গল্প আছে, কিন্তু জাহাজে ভূতের আনাগোনার গল্প ততটা বেশী নেই। সার ওয়ালটার স্কট লিখেছেন লিভারপুল-এর এক জাহাজের কাপ্তেন একজন নাবিককে গুলি করে মারে। মৃতব্যক্তির ভূত জাহাজে চড়াও হয়ে কাপ্তেনকে এত আতঙ্কিত করে যে সে ভয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ডুবে যায়। জলে পড়েও সে চেঁচিয়ে বলে ওঠে, "বিল, কী কাণ্ড, সে এখানেও আমার সঙ্গ নিয়েছে!" লর্ড বায়রন একটি গল্পে বলেছেন যে কাপ্তেন কিড নামে এক জাহাজের কমাণ্ডারের বিছানার উপর এক ভূত এসে বসে পড়ে। তিনি তার গায়ে হাত দিয়ে দেখেন তার দেহটা কেমন ভিজে ভিজে। সে তাঁর সহোদর ভাই। পরে জানা যায় এই ভাইটি ভারত-মহাসাগরে ডুবে মারা গিয়েছে।

কিন্তু "মারী সেলেসটি"র ("Marie Celeste", 1872) রহস্য নিশ্চিতই ভূতের কীর্তি। এটি একটি পোলটার ভূত। দুই মাস্তুলের মার্কিনী জাহাজখানি লিসবন ও অজোরস দ্বীপের মাঝে হঠাৎ পরিত্যক্ত হয়ে ভাসতে থাকে। কেন, তার কারণ তখন জানা যায়নি। ভূত-বিশেষজ্ঞ হ্যারী প্রাইস বলেছেন (১৯৪৫) যে নিশ্চয়ই একটি ভয়ঙ্কর পোলটার ভূত নাবিকদের ও আরোহীদের তাড়িয়ে জলে ফেলে দেয়। প্রাইস আরো কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন যে ভূতেরা কেমন করে জাহাজগুলো ধ্বংস করেছে। নিউ ক্যাসলগামী একটি জাহাজকে ভূতেই ডুবিয়ে দেয় (১৬৭২)। পোলটার ভূত যদি মানুষকে বাড়িছাড়া করতে পারে তবে জাহাজছাড়া করতেই বা পারবে না কেন?

কিন্তু পৃথিবীর ভূতের ইতিহাসে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্ব-পূর্ণ ঘটনার স্রষ্টা তুই মার্কিনী ভগ্নি। এরাই প্রেততত্ত্ববাদ বা Spiritualism-এর জন্ম দেয়। ঘটনাস্থল নিউ ইয়র্ক স্টেট-এর ওয়েন কাউন্টির হাইডস ভিল গ্রামের একটি ভগ্ন কাঠের বাড়ি। জন ফক্স নামে একজন দরিদ্র কৃষকের গৃহ। পত্নী ও তুটি কন্যা, মারগারেট (১০) ও কেটকে (৭) নিয়ে তার সংসার। তাঁরা সবাই ধার্মিক মেথডিস্ট।

১৮৪৮ সালের মার্চের এক প্রভাতে হঠাৎ সে বাড়ির দরোজা জানলা ও দেওয়ালে অদ্ভুত ধরনের খটখট শব্দ ও ধাক্কা দেওয়ার আওয়াজ হতে লাগল। দিনে রাতে সমানে চলল আওয়াজ—শব্দের তীব্রতা বেড়েই চলল এক মাস ধরে। শেষ অবধি মনে হল যেন সমস্ত বাড়িটা কাঁপছে। আকস্মিকভাবে ঐ কাঁপুনির মধ্যে কেউ কেন যেন হাততালি দেয়, সঙ্গে সঙ্গে হাততালির উত্তরে আর একজন কে হাততালি দিয়ে উঠল। কেউ আঙুল মটকালো, আবার কে যেন আঙুল মটকিয়ে প্রত্যুত্তর দিল। মারগারেট এবার হাততালি দিল, জবাবে হাততালি ভেসে এল। মারগারেট হতচকিত হয়ে মা বাবাকে ডাকতে ছুটল। জন ও তাঁর স্ত্রী জানতেন তাঁদের বাড়িটা হানাবাড়ি হয়েছে এবং অস্থির অসুখী কোন প্রেতাত্মা আওয়াজ তুলছে। তাঁরা তখন পরপর কয়েকটা ঘা মারলেন। এবার জবাবে প্রেতাত্মা শব্দ করে পরিষ্কার কী যেন সংকেতে বলতে চাইল। ভূতের সঙ্গে মানুষের একটা বোঝাপড়া ও নিকট সম্বন্ধ তৈরী হল যা অভূতপূর্ব ও অকল্পনীয় ছিল এতদিন।

প্রথমতঃ প্রেতাত্মা ফক্স-কন্যা তুইটির বয়স বিশেষ ঠক্ ঠক্ শব্দ

করে জানাল। তারপর বর্ণমালা অক্ষরগুলি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে দুবার 'নক' (Knock) করে নিজের বীভৎস কাহিনী শোনাল। জানা গেল চার্লস রোজসা নামে একজন ফেরিওয়ালার ভূত সে। এক রাত্রে সে এই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল, গৃহকর্তা তাকে হত্যা করে দেহ ভূগর্ভস্থ কক্ষে (Cellar) কবরস্থ করে। এ কথা জানিয়ে প্রেতাত্মা বিশেষ শব্দ করে বললে তার মৃতদেহ যদি কেউ উদ্ধার না করে তবে তাকে চিরদিনের জন্য প্রেত হয়ে থাকতে হবে। এ অত্যাশ্চর্য খবর জন তৎক্ষণাৎ স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে জানায়, সেলার খুঁড়ে একটি মানুষের দেহাবশেষ মেলে। বহু লোক এসে ভূতের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। উত্তেজনা ও লোকের ভীড়ে জায়গাটা গমগম করতে লাগল।

কিন্তু এতো গল্পের সূত্রপাত। আসল গল্প এবার শুরু। পরের রাত্রিগুলি ধাক্কা দেওয়া ছাড়া মরণপণ লড়াই ও ভারী দেহ টেনে হিঁচড়ে নেবার শব্দ হতে লাগল। ফক্স পরিবার এবার পাগল হয়ে যাবার ভয়ে গৃহত্যাগ করে এক বন্ধুর গৃহে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু হাজার হাজার দর্শক এসে ভূতের সঙ্গে বাতচিৎ চালাতে লাগলেন। অবশেষে একজন ভূতকে জিজ্ঞাসা করল তার কোন বার্তা বা বাণী (message) দেবার আছে কিনা। মুহূর্তমধ্যে ঠক্ ঠক্ শব্দের সাহায্যে ভূত জানাল—"বন্ধুগণ, তোমরা জগতে সত্য প্রচার কর। নতুন যুগ আগত, এ কথা গোপন করো না। তোমরা যদি তোমাদের কর্তব্য কর তবে ঈশ্বর তোমাদের রক্ষা করবেন এবং সাধু আত্মারা তোমাদের দিকে নজর দেবেন।"

ডারউইন (১৮০৯-৮২)-এর বিবর্তনবাদ চালু হবার পর থেকে মানুষের আত্মা অমর। এই প্রচলিত বিশ্বাসে ভাঁটা পড়েছে। তাই আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে মানুষেরা পরলোকের বার্তা জানবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। সুতরাং ফক্স ভগ্নিদের নব আবিষ্কার—

মানুষের আত্মা অমর এবং সে জীবিত মানুষের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করতে সক্ষম—সাতিশয় আগ্রহ সহকারে গৃহীত হল সর্বত্র। সন্দেহবাদের তিলমাত্র রেশ রইল না কোথাও। প্রেতাত্মাবাদ (Speritualism) একটা ধর্ম বলে স্বীকৃত হল, হাজার হাজার লোক এই নবধর্মে দীক্ষিত হল। মারগারেট ও কেট ফক্স দেশে বিশেষ যশস্বিনী হয়ে উঠল। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে প্রেতাত্মার সঙ্গে কথা বলা- ঠক্‌ঠক্ শব্দ করে, স্বয়ংক্রিয় লেখার দ্বারা, সম্মোহনের (Hypnotism) সাহায্যে কথা বলে ভূতের আবির্ভাব ঘটানো—আমেরিকা ও য়ুরোপে একটা রেওয়াজ (Craze) হয়ে উঠল।

পরবর্তী কয়েক বছর ফক্স বোনেরা বিতর্কের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। কেউ তাদের বলল, 'ত্রাণকর্ত্রী' (Messiah), কেউ বা ঘোষণা করল তারা 'জোচ্চোর'। সতত সাধারণের দৃষ্টিপথে থেকে তারা অতিষ্ঠ হয়ে এক সময় বলে ফেলল যে তারা যে ভূতের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তা সব মিথ্যা, অলীক (১৮৮৮)। সবাই ভাবল এবার প্রেততত্ত্ব-বাদের অস্তিত্ব বিপন্ন। কিন্তু পরমুহূর্তে মারগারেট প্রকাশ করে দিল কোন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি টাকা দিয়ে তাদের দ্বারা মিথ্যা কথা বলিয়েছেন। কিন্তু স্বীকৃত টাকা তারা পায়নি, তাই তারা যে কথা বলেছিল তা সত্যিই মিথ্যা। ভূতের সঙ্গে তাদের কথাবার্তা সত্যিসত্যি হচ্ছিল ও হচ্ছে।

ভগ্নী দুজন পরবর্তীকালে টাকা পয়সা নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি শুরু করে এবং তাদের প্রচলিত নতুন ধর্ম (Spiritualism) সম্বন্ধে লোকের আস্থা ক্ষীণ হয়ে আসে। কিন্তু প্রেততত্ত্ববাদ জোর কদমে এগিয়ে চলে এবং প্রেত ও ভূতের সঙ্গে মিলনে মানুষের যে চিরন্তন আশা ছিল তা পূর্ণ হবার অনেক বিশ্বাস্য প্রমাণ মিলতে থাকে। এবার অতি শীঘ্র অদ্ভুত ও বিতর্কিত 'Spirit photographs' 'ভূতের ফোটো' তোলা হতে থাকে।

৭

স্পিরিট ফোটোগ্রাফস—খাঁটি না জাল ?

স্পিরিচুয়ালিজম (প্রেততত্ত্ববাদ)-এর মূল বিশ্বাস হচ্ছে, মানুষ অমর, মৃত্যুর পর তার আত্মা (Spirit) পারলৌকিক মাধ্যমের (medium) সাহায্যে মানুষের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করতে পারে। ভূতের অস্তিত্বে প্রেততত্ত্ববিদ্‌দের দৃঢ় বিশ্বাস আছে—তাঁরা মনে করেন Seance-এ (ভূতবিশেজ্ঞদের সম্মেলনে) বসে ভূত দেখা যায় এবং তার সঙ্গে কথাবার্তা বলা সম্ভব। ফক্স ভগ্নীদ্বয়ের আমল থেকে স্পিরিচুয়ালিজমের উদ্দেশ্য ও অবদান সম্বন্ধে বহু তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। কিন্তু ক্যামেরার সাহায্যে প্রেতাত্মার যে সব ফোটো তোলা হয়েছে সেগুলি অবিশ্বাসীকে হতচকিত করেছে। একটি কথা আছে—A camera can not lie তা যদি হয়, ক্যামেরা যদি কখনো মিথ্যা না বলে, তা হলে বিশেষজ্ঞেরা যে সব আলোকচিত্র তুলেছেন সেগুলির সত্যতা তো মানতেই হয়। তবে ক্যামেরারও কারচুপি, চাতুরী থাকতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে তা ধরাও পড়েছে। তাই ক্যামেরা যে সতত সত্যবাদী সে কথা মানতে দ্বিধা আসবেই।

যদিও লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) ফোটোগ্রাফিক আইডিয়ার জনক, যোসেফ নিপচে ১৮২২ সালে প্রথম আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। পরে তিনি, তাঁর পুত্র ইজিডোর এবং লুই ফাগের (১৭৮৯-১৮৫১) প্লেটে ফোটো তোলার ব্যবস্থা করেন। ফলে প্রেতবিশেষজ্ঞেরা সুযোগ পেলেন ভূতের ছবি তুলে লোকের বিশ্বাস জন্মাতে। কিন্তু প্রতারকেরাও সুযোগ নিতে দেরী করল না। সেজন্য অত্যন্ত প্রমাণাসিদ্ধ 'প্রেতের ফোটোগ্রাফও' (Spirit

photograph লোকে সহজে বিশ্বাস করতে চায় না। কয়েকটি spirit photograph-এর ইতিহাস আলোচনা করলে ব্যাপারটা বোধগম্য হবে।

সর্বপ্রথম প্রেতের ফোটোগ্রাফ তোলেন বোষ্টন-এর একজন ক্ষোদক ও এমেচার আলোকচিত্রকর উইলিয়ম মামলার। ১৮৬০ সালে তিনি ভূতের ছবি তোলা শুরু করেন, ১৮৬২ সালে একজন মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মার ফোটো তুলে সবাইকে দেখান। ফোটোতে দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট একটি নারীমূর্তি মামলার-এর দেহে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। মূর্তিটি তার একটি কাজিনের, বারো বছর আগে সে দেহত্যাগ করেছে। একা ঘরে তিনি ছবি তুলেছেন বলে জানালেন। এ ফোটোটি প্রত্যাশিতভাবে কৌতূহলের উদ্রেক করল। এবং বহু স্বদেশবাসীর অনুরোধে তিনি অনেকের ফোটো তুললেন সঙ্গে 'extras', ভৌতিক মূর্তি। কিন্তু মামলার-এর চাতুরী শীগগিরই ধরা পড়ল। একজন মক্কেলের ফোটোর সঙ্গে যে 'স্পিরিট'টি তিনি দেখালেন সেটি একটি জীবিত লোকের ছবি। কিছুদিন আগে এ ব্যক্তির ছবি তিনি তুলেছিলেন। ১৮৬৮ সালে নিউ ইয়র্কের আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ হয়, তখন তাঁর ক্যামেরার চাতুরী তিনি প্রকাশ করেন—নেগেটিভের উপর দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রকৃতি স্থাপন করে প্রিন্ট করার সময়ে কৌশলে দ্বিতীয় মূর্তিটি অস্পষ্ট করে তোলা হয়। প্রেততত্ত্ববিশারদেরা এই ঘটনায় মুষড়ে পড়লেন কেননা তাঁরা মামলার-এর কাজ এতদিন সজোরে সমর্থন করে এসেছেন। কিন্তু এ খবর য়ুরোপে ও আমেরিকার ধূর্ত আলোকচিত্রকরদের সৌভাগ্যের সূচনা করল।

মামলার-এর যোগ্য শিষ্য হলেন ফরাসী ফোটোগ্রাফার এডুয়ার্দ বুগে। তাঁর ছবিগুলি পরিচ্ছন্ন জালিয়াতির ক্লাসিকাল নিদর্শন। প্রথম প্রথম তিনি ভূতের ছবি জীবন্ত মডেল থেকে নিতেন। পাছে

ধরা পড়েন তাই অতি দ্রুত ডামিকে ড্রেস করিয়ে কাজ চালাতে লাগলেন। কার্ডবোর্ডের পুতুল, ভাস্করের তৈরী মার্বেলের মাথা এবং নানা ধাঁচের পোশাক-আশাক তিনি বিনা দ্বিধায় ব্যবহার করতেন। একজন অসন্তুষ্ট মক্কেলের নালিশের জন্য পুলিস তাঁর স্টুডিওতে চড়াও হয়ে তাঁর ব্যবহৃত জিনিসের স্টক দেখে অবাক। লেখক ফ্রামারিউঁও তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন। শাস্তি হল এক বছরের জেল। কিন্তু বুগের সুনাম এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, তাঁর মক্কেলরা মনে করত তাঁর তোলা স্পিরিট ফোটোগ্রাফের ছবি খাঁটি।

ব্রিটেনের প্রতারক ফোটোগ্রাফার হচ্ছে রিচার্ড বুরমনেল। সে মামলার-এর মত ডবল এক্সপোজার করে ফোটো তুলত। মৃত ব্যক্তির ফোটো সে কাজে লাগাত। একজন মৃত সৈন্যের ছবি তার মা ও পত্নীর সঙ্গে ক্যামেরায় সে তুলেছিল সুপার ইমপোজিশন করে।

শুধু পুরুষেরাই মিথ্যা করে সাজিয়ে ফোটো তোলেনি, মেয়েরাও পিছনে পড়েনি। কয়েকজন নারী মিডিয়াম, সাউথ আমেরিকার মাদাম অলিভিয়া এবং মিসেস আডা ডীনও এ ব্যাপারে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন। আর্মিসটিস ডে-তে সেনোটাফকে (Cenotaph) ঘিরে কতকগুলি মুখ উড়ে বেড়াচ্ছে দেখিয়ে মিসেস ডীন সবাইকে চমৎকৃত করে দিয়েছিলেন। অবশ্য "ডেইলী স্কেচ" পত্রিকা তাঁর জুয়োচুরি ধরে ফেলে। মাদাম অলিভিয়া ভূতের ছবি তোলেননি, তিনি ভৌতিক আলোর (psychic light) সাহায্যে মক্কেলদের ভবিষ্যৎ বলে দিতেন। মিসেস ডীন লণ্ডনের একজন পরিচারিকা ছিলেন, ভাইয়ের কাছে ফোটোগ্রাফী শিখে তিনি আদ্যিকালের বিখ্যাত পুরুষ ও নারীর ভূতের ছবি তুলতে আরম্ভ করেন। রেড ইণ্ডিয়ান দলপতি বা মিশরীয় রাজপুত্রদের ভূতের ছবি তিনি জনসাধারণকে দেখিয়েছেন। অবশ্য এ সব চাতুরী ক্রমশ প্রকাশ পায়।

সেনোটাফের চারধারে যে মাথাগুলি উড়েছিল সেগুলি জীবিত কয়েকজন ফুটবল খেলোয়াড়ের। খবরের কাগজ বা ম্যাগাজিন থেকে ছবি কেটে তিনি কৌশলে তা কাজে লাগিয়েছেন।

স্পিরিট ফোটোগ্রাফের প্রমাণসিদ্ধতা নিয়ে খবরের কাগজ ছাড়াও আটলানটিকের উভয় তীরে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রামাণিক প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। সাইকিকাল সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট, প্রসিদ্ধ পদার্থবিজ্ঞানবিদ সার উইলিয়ম ক্রুক্স্ (১৮৩২-১৯১৯) ভৌতিক-তত্ত্ব নিয়ে আজীবন আলোচনা করেন। ১৮৭১ সাল থেকে তিনি সিয়ানস (Seance) ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে সচেষ্ট ছিলেন। ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি প্রমাণসিদ্ধ আলোচনা করেছেন আত্মজীবনীতে (Researches in the phenomena of spiritualism)। ফক্স ভগ্নীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাঁর বিশ্বাস দৃঢ় হয় প্রেততত্ত্ব বিষয়ে। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান এ ব্যাপারে হচ্ছে ফ্লোরি কুক নামে একটি মিডিয়ামের সাহায্যে কেটি কিং নামে একটি প্রেতের সঙ্গে ভাব বিনিময়।

জলদস্যুনেতা জন কিং-এর কন্যা কেটি কিং-এর প্রেতাত্মা লণ্ডনের নাম করা মিডিয়াম ফ্লোরি কুক আনয়ন করতে সমর্থ হন। ক্রুকস্ কেটিং-এর আত্মাকে শুধু দেখেনান, তাকে স্পর্শ ও আলিঙ্গন করেন। বিশেষ বৈজ্ঞানিক উপায়ে তিনি কুককে পরীক্ষা করেছেন—গ্যালভানোমিটার সংযুক্ত ইলেকট্রিক সারকিটে তাকে বসিয়ে দেখেছেন কুক অনড় অচল অবস্থায় প্রেতাত্মাকে আনে। ক্রুকস্ কেটির প্রেতাত্মার চল্লিশটি ফটো তোলেন। একটি ছবিতে দেখা যায় প্রেতাত্মা তাঁর হাত ধরে ঝুলে আছে। ক্রুকস্-এর মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের লোকেরা অনেকগুলি ফোটো নষ্ট করে। কয়েকটি ছবি এখনো আছে। সন্দিগ্ধ সমালোচকেরা কিন্তু কেটির সঙ্গে কুক-এর চেহারার সাদৃশ্য আবিষ্কার করেন এবং কেউ কেউ বলেন যে কেটি তার প্রেমিকা ছিল। আত্মজীবনী প্রকাশ হবার পর ক্রুকস্-এর

রয়েল সোসাইটির ফেলোশিপ বাতিল হবার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত অটল ছিল।

যে সময়ে ফ্লোরি কুক ছোট ছোট দলের সামনে তার প্রেতাত্মা আনয়নের ক্ষমতা দেখাচ্ছিল, সেই সময় দু ভাই তরুণ আমেরিকান প্রকাশ্যে স্টেজের উপর তাদের রহস্যময় শক্তির প্রদর্শনী খুলল। ইরা ও উইলিয়াম ডেভেনপোর্ট ফক্স ভগ্নিদের প্রতিবেশী। তাদের বাড়িতে ভূতুড়ে গোলমাল (noises) শুরু হতে থাকলে তারা ঘোষণা করল যে ভূতের দ্বারা তারা কাজ করাতে পারে। দু ভাইকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হল, তৎসত্ত্বেও ভূতের গোলমাল চলতে থাকে। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা দেখে দু ভাই পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ল প্রেতাত্মার কার্যাবলী দেখানোর জন্য। এরা খাঁটি মিডিয়াম না সফল প্রতারক তা আজ অবধি প্রমাণিত হয়নি। যে সব ফোটোতে তাদের কৃতিত্ব ধৃত হয়েছে সেগুলি নিশ্চিত প্রমাণ করে যে তারা ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মিডিয়াম। তাদের ইচ্ছামত প্রেতেরা কাজ করতে বাধ্য হত।

ঠিক ঐ সময়ে যোসেফি বলে আর একজন মিডিয়াম আমেরিকায় ও য়ুরোপে প্রকাশ্যে প্রেতাত্মা এনে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। তার আনীত প্রেতাত্মার একটি ছবিতে দেখা যায় ফুলবাগানে একটি সুন্দরী মহিলা দাঁড়িয়ে—ছবিটির নাম "The spirit of flowers". স্টেজের উপর এ দৃশ্য অলৌকিক কাণ্ড বলে পরিগণিত হয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দুটি জগৎজোড়া নাম প্রেততত্ত্ববাদ ও ও স্পিরিট ফোটোগ্রাফীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। শার্লক হোমস-এর জনক সার আর্থার কনান ডয়েল (১৮৫৯-১৯৩০) ও আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঐন্দ্রজালিক হ্যারী হুডনী উভয়ে বহু বছর ধরে প্রেততত্ত্ব নিয়ে মগ্ন ছিলেন। ডয়েল গভীর বিশ্বাসী, হুডনী প্রচণ্ড সন্দিগ্ধ। ডয়েল সাউথ সীর একজন সাধারণ ডাক্তার, ১৮৮৭ সাল থেকে টেলিপ্যাথী নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেন। পরে সিয়ানস তত্ত্বে

আগ্রহী হয়ে ১৯০২ সালে সার অলিভার লজ (১৮৫১-১৯৪০)-এর সঙ্গে দেখা করেন। লজ সে সময়কার শ্রেষ্ঠ প্রেত-বিশারদ। ডয়েল সে সময় থেকে সিয়ানস, মিডিয়াম, প্রেত প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। ইতিমধ্যে তাঁর পত্নী ও একটি পুত্র মারা যান। ডয়েল-এর মিডিয়ামে বিশ্বাস অকাট্য হয়ে ওঠে। তাঁর অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি অনেক বই লিখেছেন, একজন ওয়েলশ মিডিয়ামের সাহায্যে তিনি মৃতপুত্রের কণ্ঠস্বর শোনেন। দুজন মার্কিনী মিডিয়াম তাঁর মৃতা জননীর প্রেতাত্মাকে আনয়ন করে। ডয়েল তাঁর মাকে জড়িয়ে ধরেন। অবশ্য কিছুদিন পর পুলিস এই দুজন মিডিয়ামকে প্রতারক বলে ঘোষণা করে তাদের নানা প্রকার সাজরসঞ্জাম (মুখোশ পরচুলা, শিফন, গানের বাক্স, সুগন্ধ দ্রব্য ছিটানর যন্ত্র ইত্যাদি) আবিষ্কার করে। হুইটম্যান নামে একজন যাজক এ ঘটনা নিয়ে চমৎকার একটি প্রবন্ধ লিখেছেন।

কনাল ডয়েল-এর অবিচলিত আস্থা ছিল মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে এবং প্রেতাত্মার সঙ্গে সংযোগসাধনের সম্ভাবনায়। স্পিরিট ফোটোগ্রাফ তুলে তিনি নানান জায়গায় সবাইকে দেখান ও বক্তৃতা করেন। নরউইচ-এর দুশো বছরের প্রাচীন একটি হোটেলের ছবি তোলেন একটি পেত্নী সহ। উইলিয়াম হোপ নামে একজন স্পিরিট ফোটোগ্রাফারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্টতা হয় এবং "The case for spirit photography" (১৯২২) পুস্তকে হোপের প্রকৃত দক্ষতার কথা উল্লেখ করেন। "Since then many special tests have been demanded of him and have been successfully met." হোপের তোলা প্রেতাত্মার ছবিতে ডয়েল নিজে উপস্থিত থেকেছেন এবং তাঁর "honesty and frankness" সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। তিনি বিভিন্ন psychic college ও societyর সভ্য ছিলেন। ডয়েল তাঁর দ্বিতীয়া পত্নীর মাধ্যমে একটি ভূতের সঙ্গে কথা বলে এমন সব তত্ত্ব শোনেন যা তাঁর স্ত্রীর জানবার কথা নয়। ডরসেট-এ একটি হানাবাড়িতে তিনি

নিজে তদন্ত করেন এবং প্রচণ্ড গোলমাল শোনেন। সে বাড়িটি পরে আগুনে পুড়ে গেলে বাগান খুঁড়ে একটি বালিকার কঙ্কাল পাওয়া যায়। ডয়েল মনে করেন এই বালিকার প্রেতাত্মাই পোলটার ভূত হয়ে উপদ্রব করছিল।

কনাল ডয়েল যে কখনো কখনো প্রেতবিশারদদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন তা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু শারলক হোমস গল্প রচনায় তিনি যে বিচারশক্তি ও সত্য সিদ্ধান্তের পরিচয় দিয়েছেন তারপর তাঁর চরিত্রে সহজবিশ্বাসপরায়ণতা (gullibility) অকল্পনীয় বলে মনে হয়। কতকগুলি ঘটনায় তিনি যে বিশ্বাস দেখিয়েছেন সেটা যুক্তিতর্কে হঠানো চলে। কিন্তু প্রেম সম্বন্ধে, অন্তত অংশত, তাঁর কিছু কিছু মতবাদ নিঃসংশয়ে খাঁটি।

ডয়েল তাঁর মৃত্যুর পর অজস্র স্পিরিট ফোটোগ্রাফারের আলোকচিত্রে ধরা পড়েছেন।

ডয়েল-এর মতে যাদুকর হুডিনী জীবনের বেশীর ভাগ সময় প্রেততত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনা, গবেষণা ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। মৃতা জননীর আত্মার সংস্পর্শে আসার জন্য তিনি প্রেততত্ত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। আমেরিকা ব্রিটেন ও য়ুরোপে সর্বত্র তিনি মিডিয়াম ও প্রেততত্ত্ববিদগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে তর্কবিতর্ক করেছেন। অবিশ্বাসী ও সন্দেহবাদীর সঙ্গেও তিনি মোলাকাত করেছেন। কনান ডয়েল ও অলিভার লজ-এর কৃতিত্বে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। জীবিত বন্ধুদের সঙ্গে তিনি বন্দোবস্ত করেছিলেন তাঁরা যেন মৃত্যুর পর পরলোক থেকে তাঁর সঙ্গে কথা বলে, তাঁকে দেখা যায়। "But I never received a word," বলে তিনি হতাশা প্রকাশ করেন। ডয়েল তাঁকে বলেছেন যে তিনি প্রেতাত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না কেননা তিনি অবিশ্বাসী, সন্দিগ্ধচেতা। যে মানসিক প্রস্তুতি থাকলে স্পিরিটের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব তা

তাঁর নেই। হুডনি গভীর মনোনিবেশ সহকারে seance-এ বসেছেন, ফোটোগ্রাফাররা উল্লেখযোগ্য প্রেতাত্মার আলোকচিত্র তুলেছেন, কিন্তু হুডিনি সব ব্যাপারটাকে 'ফেক', জাল বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। "A magician among the spirits" (১৯২৪) গ্রন্থে তিনি বলেছেন, "I have not found one incident that sovoured of the genuine." যারা "intensely willing to believe" তাদের "deluded brains" ভূতপ্রেত দেখে ও স্পিরিট ফোটোগ্রাফীতে আস্থা রাখে।

কনান ডয়েল হুডিনিকে আমেরিকার নামজাদা স্পিরিট ফোটোগ্রাফার আলেকজান্দার মার্টিন-এর কাছে পাঠান। মার্টিন হুডিনির ফোটো তোলেন, সে ফোটোর চারিদিকে লিঙ্কন, রুজভেল্ট প্রভৃতি বিশিষ্ট লোকদেব অস্পষ্ট ছবিও দেখা যায়। হুডিনি ফোটোকে "simply a double exposure" বলে বাতিল করেন।

আর একজন অতি বিখ্যাত মিডিয়াম বোস্টনের মিসেস গডার্ড ক্রানডন ("মাগারি" বলে সমধিক পরিচিত)। রেলওয়ে দুর্ঘটনায় তার ভাই ওয়ালটার মারা যায়। তার প্রেতাত্মা মারগারির পরিচালক। এই প্রেতাত্মার সাহায্যে অদ্ভুত আওয়াজ, নয়টি ভাষায় ট্রান্সে লেখানো ঘরের জিনিসপত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করা, ভূতের মুখ হাজির করা ও প্রেতের ফোটো তোলা প্রভৃতি তার আয়ত্তাধীন ছিল। "সায়ান্টিফিক আমেরিকান" পত্রিকা আড়াই হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেন মারগারির ক্ষমতার সত্যতা বা অলীকতা প্রমাণকারীর জন্য। কতকগুলি সিয়ানস হল বিশিষ্ট লোকদের সামনে। হুডিনিও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু উপস্থিত দর্শকেরা খুব বেশী খুশী হলেন না। মারগারি হুডিনিকে নিয়ে সিয়ানস-এ বসতে আর রাজী হলেন না। কেননা হুডিনি তার সর্বনাশ করছেন। হুডিনি অবিলম্বে একটি রিপোর্ট লিখে মারগারের কারচুপি ধরিয়ে দিলেন এবং ঘোষিত পুরস্কার দাবী করেন। অবশ্য পুরস্কার তাঁকে দেওয়া হয় না। মারগারি পরে য়ুরোপেও তাঁর দক্ষতা দেখিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেন। তার মাধ্যমের

যোগ্যতাকে "The most remarkable ever recorded" বলে গৃহীত হয়েছিল সর্বত্র।

আর একজন ইংরেজ, উইলিয়াম ম্যারিয়ট, ছিলেন যাদুকর ও বিভ্রমসৃষ্টিকারী (illusionist)। স্পিরিট ফোটোগ্রাফ নিয়ে বহুদিন ধরে আলোচনা করে তিনি প্রকাশ করেছিলেন কেমন করে জাল ফোটো তোলা যায়। প্রচলিত অনেক ফোটোগ্রাফের অলীকত্ব তিনি আবিষ্কার করেন এবং বিশেষ গুপ্ত প্রতিষ্ঠান যেখান থেকে মিডিয়ামদের নানা সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করা হত "সাইকিক ট্রিকস" এর জন্য তাও তিনি জনসাধারণের সমক্ষে ধরিয়ে দেন। শিকাগোর র‍্যালফ সিলভেসটার এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। পৃথিবীর সব মিডিয়ামের কাছে তিনি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বিক্রী করতেন এবং একটি পুস্তিকায় সাজসরঞ্জামের লিস্টও পাঠাতেন যথাস্থানে (১৯০১)। কয়েকটি জিনিসের নাম (হ্যারী প্রাইস লাইব্রেরী, লণ্ডনে ক্যাটালগটি আছে) দেওয়া হল :—স্লেটে লেখার যন্ত্রপাতি, স্বয়ংক্রিয় গীটার, ভৌতিক দড়ি, জাল তালা, হস্তবন্ধনী, বেঞ্চ, স্বয়ংশব্দকারী টেবিল, প্রেতের মুখ ও হাত, প্রেতের পুরো মূর্তি প্রভৃতি। পুস্তিকায় এ সব ব্যবহার করবার প্রণালী সম্বন্ধেও গোপন তথ্য দেওয়া আছে। ম্যারিয়ট এই সব যন্ত্রপাতি নিয়ে প্রকাশ্যে ছবি তোলেন। ফলে, নানাদেশের মিডিয়ামরা মুশকিলে পড়েন। বহু অর্থব্যয়ে তাঁরা এ সব দ্রব্য সংগ্রহ করেছেন আর ম্যারিয়ট কিনা তাদের অর্থপ্রাপ্তির পথে কাঁটা দিচ্ছেন। ম্যারিয়ট নিজে স্পিরিট ফোটোগ্রাফ তুললেন। দেখালেন একটি অপরূপা রূপসী বালিকার প্রেতাত্মা তাঁর হাত ধরে ঝুলছে!

ম্যারিয়ট-এর কীর্তিকাহিনী দেখে শুনে শেষ বয়সে কনান ডয়েল বলেছিলেন যে "spirit photography was not all that was claimed." আজীবন গভীর বিশ্বাসী ডয়েল-এর আস্থা নড়ে উঠল ম্যারিয়ট-এর জীবনব্যাপী সাধনার ফলে।

এইভাবে স্পিরিট ফোটোগ্রাফারদের ব্যবসা ডুবিয়ে দিলেন ম্যারিয়ট। কিন্তু ভূতের ফোটো তোলা বন্ধ হল না। বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর নানান জায়গায় প্রেত দেখা দেয় এবং তাদের ফোটোও তোলা চলতে থাকে।

৮

বিংশ শতাব্দীর ভূত

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে 'সোসাইটি ফর সাইকিকাল রিসার্চ' জনমত সংগ্রহ করে জেনেছেন প্রতি ষোল জনের মধ্যে একজন মানুষ ভূত দেখেছে বা ভূতের কথা (noise or talk) শুনেছে। রাজনৈতিক মত-সংগ্রহের দ্বারা যেমন জনসাধারণের মনোভাব জানা যায় এই 'গোষ্টপোল'ও তেমনি ভৌতিক ব্যাপারে মানুষের আস্থার প্রমাণ দিচ্ছে। সবাই ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না এ যেমন সত্যি, সাধারণ মানুষের একটা বিপুল অংশ যে আন্তরিকতার সঙ্গে এ বিষয়ে চিন্তা করতে রাজী সেও তেমনি সত্যি।

অলৌকিক গূঢ় তত্ত্বের নানান দিক দিয়ে গভীর আলোচনা হয়েছে বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে। পশ্চিমী জগতে নিত্য নতুন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সোসাইটি গড়ে উঠছে। ব্যক্তিগতভাবেও অনেক সুপার ন্যাচারালের রাজ্যে প্রবেশে আগ্রহী হ'য়ে যাদুবিদ্যা, অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব, ভূত প্রেত ডাইনী ইত্যাদি নিয়ে যথেষ্ট পর্যালোচনা করেছেন। এখনকার অলৌকিক বিষয়ে জ্ঞানার্জনে উৎসাহী ব্যক্তিরা প্রচলিত ঘটনা নিয়ে পুনরালোচোনা না করে পৃথিবীর ও মানুষের আদিম উৎপত্তি বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে নূতন চিন্তাধারার বিকাশ ঘটাচ্ছেন, চলিত মত ও পথের পরিবর্তনও সম্ভব হচ্ছে। প্রাচীন কাহিনী বর্ণিত সূত্র অবলম্বন করে অতি আধুনিক পণ্ডিতেরা মনে করেন বহির্জগতের জ্ঞানবৃদ্ধ জীব বা শক্তি একদা আমাদের পৃথিবীতে আনাগোনা করেছেন আমাদের উন্নতি ও মঙ্গল বিধানার্থে।

স্পিরিট ফোটোগ্রাফে অবিশ্বাস এবং প্রতিকূল সমালোচনা

সত্ত্বেও প্রেততত্ত্ববাদের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে যে উৎসবের আয়োজন হয়েছিল তাতে দেখা গেল ব্রিটেনেই পঞ্চাশ হাজার উৎসাহী সভ্য রয়েছেন এবং আমেরিকায় কম করে এর চেয়ে পাঁচগুণ বেশী সভ্য সংখ্যা। সিয়ানস প্রকাশ্যে চলতে থাকে, প্রকাশ্য সভায় মিডিয়ামরা স্পিরিট এনে তাদের ফোটোগ্রাফ তোলেন জনসাধারণের মধ্যে বিশ্বাস সৃষ্টি করতে। এ সব সভায় যে সব প্রেতাত্মা উপস্থিত হয়েছিল তাদের কারো শুধু মুখ, কারো বা বস্ত্রাবৃত সম্পূর্ণ দেহ ফোটোতে ধরা পড়ে। একটোপ্লাজম নামক একজাতীয় শ্বেতপদার্থ থেকে প্রেতমূর্তি গড়ে ওঠে। মিডিয়ামের দেহ থেকে একটোপ্লাজম বা টেলিপ্লাজম বহির্গত হয়। এ বস্তুটির মসলিন বা আঠালো কাই-(paste jelly) এর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এবং প্রতারকেরা এ দ্রব্যগুলি একসময়ে ব্যবহার করত ভূতের মূর্তি তৈরী করতে।

উনিশ শ বিশ সাল থেকে অতীন্দ্রিয় বস্তুর (Psychic phenomena) গবেষণা চরমোৎকর্ষ লাভ করে। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে অবিশ্বাসী সমালোচক কিন্তু মিডিয়ামের চরিত্রে কালিমা লেপনে ব্যস্ত থাকে এ সময়, তার কৃতিত্ব তুচ্ছ করে। মিডিয়াম বা অনুসন্ধিৎসুর রিপোর্টের সামান্য ত্রুটিবিচুতিকে পাহাড়-প্রমাণ অতিরঞ্জিত করে হৈ চৈ শুরু করা একটা ফ্যাসান হয়ে উঠেছিল। বহুবিশিষ্ট জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির চাক্ষুষ প্রমাণকে সমালোচকেরা নিছক মুর্খমি বলে হেসে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। হ্যারী প্রাইস-এর "স্টেলা স্মি" বা ডব্লিউ. এইচ. সলটার-এর বিস্তৃত গবেষণা-গ্রন্থ "জোয়ার দি এভিডেন্স অব সাইকিকাল রিসার্চ কনসার্নিং সারভাইভাল" পড়লে অলৌকিক তত্ত্বের খাঁটি গবেষণার ইতিহাস জানা যাবে।

এই সময় একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। সিয়ানস-এ প্রেতের আগমন যে সত্যি সত্যি সম্ভব তার এক অভূতপূর্ব প্রমাণ পাওয়া গেল। মোম গলিয়ে একটি পাত্রে রাখা হ'ত। প্রেত এসে হাত বা মুখ সেই গলিত মোমে ডুবিয়ে দিত। ফলে মুখের ও হাতের

প্রতিকৃতির ছাপ মোমের উপর পড়ে যায়। ফানেক ক্লুসকি (Fanek Kluski) নামে একজন পোলিশ ব্যবসাদার, কবি ও মিডিয়াম এই উপায় আবিষ্কার করেন। উপস্থিত দর্শকেরা পরিষ্কার করে ভূতকে দেখতে না পেলেও তারা দ্রবীভূত মোমে হাত বা মুখ ডোবানর শব্দ (splashing the water) শুনতে পেতেন। মোমের হাতের সঙ্গে উপস্থিত ব্যক্তিদের হাত তুলনা করে দেখা হত, সম্পূর্ণ অন্য লোকের হাতের ছাঁচ পড়েছে মোমের উপর। প্লাসটার অব প্যারিস-এর সাহায্যে এই ছাঁচগুলিকে ঠিক করে নিয়ে পরীক্ষা করা হত। ক্লুসকির তোলা মোমের দস্তানা ও মুখ প্রেতের অস্তিত্বের জোরালো প্রমাণ। এগুলি আজও রক্ষিত আছে বিশ্বাসীর তৃপ্তিসাধনার্থে ও অবিশ্বাসীর বিশ্বাস সৃজনার্থে। তাঁর এ মডেল তৈরীর ব্যাপারে যে কারচুপি ছিল এ কথা প্রমাণিত হয়নি। তা ছাড়া মোম-দস্তানার সরু কবজির ভিতর দিয়ে মানুষের পক্ষে হাত টেনে বার করা অসম্ভব, কারণ তা হলে দস্তানাটি নিশ্চিতই ভেঙে যাবে।

ভূতের হাত ও মুখের 'ছাপ' অদ্ভুত হ'লেও ক্লুসকি ১৯১৯ থেকে ১৯২৩ সালে ওয়ারসতে যে ভয়ঙ্কর জীবজন্তু ভূত দেখিয়েছিলেন তা ভূত বিশেষজ্ঞের মতে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। সে সব সভায় উপস্থিত ছিলেন অতি বিশিষ্ট দৃঢ়মতের (Of the highest integrity") মানুষেরা। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এফ ডব্লিউ পালোসকি তন্মধ্যে একজন।

ক্লুসকি মিডিয়াম, হঠাৎ দেখা গেল বাজপাখীর মত একটি পাখী ঘরের ভিতর উড়ে বেড়াচ্ছে, পাখা ঝাপটাচ্ছে দেওয়ালে ও ছাদে। পরে মিডিয়ামের কাঁধের উপর এসে বসল। ক্যামেরা মিডিয়ামের দিকে তাক করা ছিল—সঙ্গে সঙ্গে ম্যাগনেসিয়াম ফ্লাস এর সাহায্যে ফোটো তোলা হ'ল। পাখীটিকে গোপনে ঘরে ঢোকানো বা দেখানোর পর লুকিয়ে ফেলা কিছুই সম্ভব হয়নি। মানুষের ভূতের মত এ জীবটি এল আর গেল। প্রফেসর পালোসকির চাক্ষুষ বর্ণনা

ও অভিমত। কিছু পরে এল একটি বেজি; টেবিলের উপর ঘুরে বেড়াল। উপস্থিত লোকের হাতমুখ শুঁকল ছোট ঠাণ্ডা নাকের দ্বারা। পরে এল একটি অতি বৃহৎ কুকুর, দাঁতগুলি বড় বড়, চক্ষু দুটি অন্ধকারে জ্বলছে। তারপর দেখা গেল একজন উজ্জ্বল বৃদ্ধকে, কুকুরটিও কখনো কখনো তার সঙ্গে ছিল। কিন্তু এ সবের চেয়ে ভয়ঙ্কর একটি জন্তু এল অবশেষে। একে বলে পিথেক্যানথ্রোপাস ("এপ-ম্যান")---বানর-মানুষ। প্রকাণ্ড বানর, লোমাবৃত বৃহৎ মস্তক, সমস্ত দেহ ঘন মোটা রোমে আবৃত। এরও ছবি তৎক্ষণাৎ নেওয়া হয়। একজন উপস্থিত দর্শক বলেছেন—বানরটি এত বলশালী যে অতি সহজে বই ভর্তি ভারি বুক কেস টেনে সরাতে পারে ঘরের এপাশ থেকে ওপাশ, উপস্থিত লোকদের মাথার উপর দিয়ে সোজা বহন করে নেয়, কিংবা সবচেয়ে ওজন-ওয়ালা মানুষকে দীর্ঘতম লোকের মাথার উপর দিয়ে চেয়ার-সমেত তুলে ধরে। বানরের আচরণ কখনো কখনো ভয়ের উদ্রেক করছিল, তার স্বাভাবিক কম বুদ্ধিরও পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু জন্তুটি কখনো হিংস্র হয়নি; বরঞ্চ এর ব্যবহারে সদিচ্ছা, শিষ্টতা ও বশ্যতা প্রকাশ পাচ্ছিল। ১৯১৯ সালে এর প্রথম আবির্ভাব, ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে শেষ দেখা যায় একে। প্রথম ও শেষবারের উপস্থিতিতে একই রকম মুখের ও হাতের শব্দ করেছিল।

ক্লুসকির জন্তু-প্রদর্শন অদ্বিতীয় ঘটনা নয়। লণ্ডনে ফিল্ড মার্শাল ওলসির সাক্ষাতে অপর একজন মিডিয়াম সীল (Seal) এনেছিল। কিন্তু ক্লুসকির প্রদর্শনী প্রমাণসিদ্ধ। আজ অবধি তাঁকে কেউ প্রতারক বলেনি বা তাঁর জীবজন্তুর ফটো জাল বলে প্রমাণিত হয়নি। সেজন্য তাঁকে "মিডিয়ামের রাজা" আখ্যায় ভূষিত করেছেন প্যারিসের মেটাফিজিকাল ইনটারন্যাশনাল ইনস-টিটিউটের প্রেসিডেণ্ট ডক্টর গুস্তাফ গেলে।

ভূতসৈন্যের লড়াই

প্রথম বিশযুদ্ধের অজস্র নরহত্যা ও লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুর ফলে উভয় পক্ষের সৈন্যরা ভূত দেখতে শুরু করেছিল। এটা নতুন কিছু নয়। বহু শতাব্দী ধরে এ জাতীয় কাহিনী প্রচলিত। প্রেত-সৈন্যবাহিনী ও মৃত সৈন্যের অপচ্ছায়া যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াবার গল্প প্রাচীন যুগ থেকে চালু আছে। প্লুটার্ক (৪৬—১২০ খ্রীষ্টাব্দ) লিখেছেন যে রোমান সৈন্যরা দেখেছিল থিস্যুয়ুস (পৌরাণিক গ্রীক বীর) এর প্রেতাত্মা যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধরত। এমন কি সপ্তদশ শতাব্দীতে লর্ড লুগেণ্ট বর্ণনা দিয়েছেন দুই প্রেতবাহিনী এজ হিল (Edge Hill) এর রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করছিল রাজা চার্লস ও ক্রমওয়েল-এর সৈন্যদলের যুদ্ধ হবার দু মাস পরে। "ডেইলী নিউজ" পত্রিকা রণক্ষেত্রের সত্যিকারের ভূতের কাহিনী চেয়ে গল্প চেয়েছিল। দেখতে দেখতে গল্পের বন্যায় পত্রিকা ভেসে যায় আর কি! পরে দু ভলুম ভূতের গল্প ছাপা হয়েছিল। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এ সব গল্প পর্যালোচনা করে কতকগুলিকে "results of enhaustion or hallucination," "ক্লান্তি বা মতিভ্রমের ফল" বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অপর অনেকগুলিকে কোন বিশেষ পর্যায়ে ফেলা যায় না, বুদ্ধিতে এদের ব্যাখ্যা চলে না।

মনস-(Mons, বেলজিয়াম এর শহর) এর রণভূমিতে ব্রিটিশ সৈন্য যখন প্রায় পর্যুদস্ত (অগস্ট, ১৯১৪), তখন দেখা গেল একদল ভৌতিক তীরন্দাজ আকস্মিকভাবে আবির্ভূত হয়ে জার্মান সৈন্য বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিল। এ দৃশ্য অনেকে দেখেছে। ওয়েলস (Wales) এর সাংবাদিক ও অলৌকিক গল্প-প্রণেতা আর্থার ম্যাকেন লণ্ডনের "ইভনিং নিউজ"-এর জন্য এ কাহিনী রচনা করেন ব্রিটিশ

বাহিনীর মনোবল বৃদ্ধির জন্য। দ্রুত সত্যি বলে এ গল্প সবাই মেনে নিল। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সৈন্যরা খবর পাঠাতে লাগল তারা ভৌতিক তীরন্দাজদের দেখতে পেয়েছে। ফ্রান্সে ও জার্মানীতে এ কাহিনী ছড়িয়ে পড়ল। ম্যাকেন-(Machen) এর কল্পনার প্রতিবাদ হ'ল অজস্র, কিন্তু ফল হ'ল না কিছু, এবার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদের বর্ণনা ভিত্তি করে ছবি আঁকা হ'ল (A. Forestier, শিল্পী)। মন্‌স্‌-এর যুদ্ধক্ষেত্রে দেবদূত তীরন্দাজদের নিয়ে লোকসঙ্গীত তৈরী হ'ল ("angel bowmen of mons")। ব্রিটিশ সৈন্যমহলে আশা উৎসাহের প্রবল বন্যা বয়ে গেল।

যান্ত্রিক যুদ্ধের প্রচলন হেতু আজকাল ভূত-সৈন্যের কাহিনী আর কল্পিত হচ্ছে না। কিন্তু গ্রাস্টনবেরী ও উডম্যানটনে একদা যে ব্রিটিশ ও জার্মান বাহিনীর সংঘর্ষ হয়েছিল সেখানে এখনো রাতে বীরপুঙ্গবদের পদধ্বনি শোনা যায়, মস্তকহীন ঘোড়ায় চড়া সৈন্যরা অন্ধকার উপত্যকার ভিতর দিয়ে দ্রুতবেগে ধাবিত হচ্ছে—এ গল্পও শোনা যায়।

বরলী রেকটরীর ভুত

যুদ্ধের দামামা বন্ধ হতে না হতে একটি বিখ্যাত হানাবাড়ির কাহিনী চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল—ব্রিটিশ ইতিহাসের সত্যিকারের ভূতের গল্প। বরলী রেকটরীর ভূত। বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ভূত-শিকারী ও অলৌকিক ব্যাপারে গবেষক, হ্যারী প্রাইস (Harry Price), এ কাহিনীর স্রষ্টা। বরলী রেকটরীকে তিনি "the most haunted house in England" বলে ঘোষণা করেন এবং সযত্নে এর আশ্চর্য ইতিহাস অনাবৃত করেন। অসংখ্য ফোটোগ্রাফ ও অজস্র বিবরণমূলক দলিলপত্র যা প্রাইস প্রমাণ হিসাবে রেখে গেছেন তা দেখলে ও পাঠ করলে হানাবাড়িটিতে ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস অনিবার্য হয়ে ওঠে।

এসেকস্ ও সাফোক-এর বর্ডারে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে রেকটরীটি নির্মিত হয়। অট্টালিকাটি অন্ধকার ও বিষণ্ণ। অনেকগুলি ছোট ছোট কক্ষ ও বহু বারান্দা রয়েছে। রেভারেণ্ড হেনরী বুল এর আবাস, পরে তাঁর ছেলে হ্যারী আমৃত্যু (১৯২৭) সেখানে বসবাস করে। বুলের অবস্থিতিকালে অলৌকিক কাণ্ড ঘটতে থাকে। ভৌতিক ঘোড়ার গাড়ি বাগানে ছোটাছুটি করে, সাদা পোশাক-পরা একটি তরুণী গাছগাছালির মধ্যে দ্রুত চলফেরা করত। আর অজস্র অদ্ভুত আওয়াজ শোনা যেত রেকটরীর অভ্যন্তরে। একটি নানের (সন্ন্যাসিনী) প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়াত গৃহে ও উদ্যানে।

হ্যারী প্রাইস ১৯২৯ সালে বরলীতে আসেন ঘটনাবলীর রহস্য অনুসন্ধানে। ভূতবিশেষজ্ঞ প্রাইস এই প্রাচীন কাহিনীর দ্বারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। রেকটরীতে তিনি একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং তন্নতন্ন করে তত্ত্বতালাশ শুরু করেন। পরিশেষে

ঘোষণা করেন—"ভূততত্ত্বের গবেষণায় এটি একটি সত্য ও প্রমাণিত কাহিনী। নিশ্চিত জানা যাচ্ছে প্রায় একশ বছর ধরে এ গৃহটি হানাবাড়ি হয়ে আছে।" সমস্ত সংগৃহীত ঘটনা একত্রিত করে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে চতুর্দশ শতাব্দীর একটি নিহত নানের প্রেতাত্মা রেকটরীতে আশ্রয় নিয়েছে। অবৈধ প্রেমের ফলে নানকে হত্যা করা হয় এবং তার অপচ্ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে হা-হুতাশ করে। প্রাইস যখন গবেষণারত তখনও গোলমাল (noise) হ'তে থাকে—খসখস পোশাকের আওয়াজ, ঘণ্টাধ্বনি, দরোজায় ধাক্কা, শূন্যে জিনিসপত্র ছোঁড়াছুঁড়ি প্রভৃতি সমানে চলে। তিনি বিস্মিত হয়ে ভাবলেন এ পোলটার ভূতটি (না পেত্নীটি?) প্রবেশকারীদের তাড়াতে সচেষ্ট? প্রাইস তখন সিয়ানস-এ হ্যারী বুল-এর প্রেতাত্মাকে আনলেন। তবে বিশেষ কোন নতুন খবর তাতে মিলল না।

এর পর গৃহটি পর পর দু'জন কর্তৃক অধ্যুষিত হয়। বুল পরিবারের আত্মীয় রেভারেণ্ড ফয়সটার ও তাঁর পত্নী ম্যারিয়ালী প্রথমে এলেন, ভূতের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে স্থানত্যাগে বিলম্ব করলেন না। দ্বিতীয় ব্যক্তি কাপ্তেন গ্রেগশন। তিনি রেকটরীর নাম দিলেন বরলী প্রায়য়ারি এবং ১৯৩৯ সালে তাঁর উপস্থিতিতে গৃহটি আগুন লেগে ভস্মীভূত হয়। প্রাইস কিন্তু এই ভস্মীভূত বাড়িতে যাওয়া আসা বন্ধ করলেন না। তাঁর প্রথম বই "The Most Haunted House in England" এই সময় প্রকাশিত হয়। একজন ফোটোগ্রাফের একটি আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হ'ল এই সময়ে। এই ভগ্ন ভস্মীভূত বাড়ির ছবি তুলে সে দেখতে পেল একটি ফোটোতে দেখা যাচ্ছে একখণ্ড ইঁট শূন্যে ঝুলছে। ভূগর্ভস্থ কক্ষ খুঁড়ে মৃতের কঙ্কাল পাওয়া গেল। প্রাইস মনে করলেন এবার ভূতের উপদ্রব শেষ হবে। লিখলেন "The End of Borky Rcctory" (১৯৪৫)। ১৯৪৮ সালে তাঁর মৃত্যুর পর নতুন নতুন অনেক মতবাদ প্রচারিত হ'ল। একদল বললেন, সব ব্যাপারটা প্রাইসের

উদ্ভাবন। এটা অবিশ্বাস্য। প্রাইস বহু পরিশ্রমে, যত্নে, অনুসন্ধানে অনেক সত্য ঘটনা খুঁজে বার করেছেন বিভিন্ন সময়ে। তিনি প্রতারক বা বুজরুক ছিলেন না। বরঞ্চ বুজরুকী তিনি অনাবৃত করেছেন নিষ্ঠুরভাবে। বরলীর ধ্বংসাবশেষ প্রাইসের আবিষ্কৃত বর্তমান যুগের একটি শ্রেষ্ঠ অসাধারণ খাঁটি ভৌতিক কাহিনীর নীরব স্মৃতিস্তম্ভ। এ স্মৃতিস্তম্ভ প্রাইসের অসামান্য প্রয়াসের গৌরব নিশান।

প্রেততাত্ত্বিক

দুজন ভূত-শিকারীর (ghost hunter) কথা এখানে উল্লেখ-যোগ্য। ইলিয়ট ও'ডনেল প্রাচীন আইরিশ পরিবারের সন্তান। তাঁর আত্মজীবনী "ভূতশিকারীর বিশ বছরের অভিজ্ঞতা" (১৯১৬) গ্রন্থে তিনি লিখেছেন ছাত্রজীবনে ডাবলিনে তিনি প্রথম ভূত দর্শন করেন। তখন তিনি স্থির করেন পৃথিবীর সর্বত্র তিনি ভূত খুঁজে বেড়াবেন। ব্রিটেনে, আমেরিকার বিভিন্ন শহরে, ক্যানাডায়, য়ুরোপ, এমন কি জাপানেও তিনি ভূতের সাক্ষাৎ পান। নানান রকমের প্রেতাত্মার সঙ্গে তাঁর দেখা সাক্ষাৎ হয়—জন্তুর ভূত দেখেন ও ভৌতিক ঘটনারও সাক্ষী হন। অদ্ভুত কয়েকটি হানাবাড়ির ব্যাপারস্যাপারও তিনি সমাধান করেন। চিত্রসম্বলিত বহু শত কাহিনী তিনি লিপিবদ্ধ করেন, একটি বিশিষ্ট কাহিনী এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ও'ডনেলের ভৌতিক কাহিনী প্রকাশিত হবার পর ১৯৩০ সালে আর একটি বিশিষ্ট ঘটনায় তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এ. এম. পামার। ব্রিস্টল-এর একটি হানাবাড়ি। পামার সে বাড়ির ফোটো তুলে দেখেন যে ফোটোর মধ্যে একজন সন্ন্যাসীর ছবি উঠেছে। সে ছবিটি চিঠির সঙ্গে তিনি ও'ডনেলকে পাঠান। রাত পৌনে তিনটেয় একটি কক্ষে 'অদ্ভুত আলো' দেখা যায়, তখনই ছবি নেওয়া হয়, প্রিন্ট করার পর মঙ্কের ফোটো ধরা পড়ে। ও'ডনেল সমারসেট-এর সে বাড়িতে যান এবং রাত্রে পৌনে তিনটেয় দেখতে পান কক্ষের ডান দিকে বেলুন আকারের অনুজ্জ্বল আলো প্রকাশ পাচ্ছে। ও'ডনেল আলোকে উদ্দেশ্য করে বললেন, যদি কোন আত্মা এসে থাক তবে সাড়া দাও, কথা বল, আস্তে শব্দ কর বা অন্য কোন রকমের প্রমাণ দাও। আলোটি কয়েক ফুট এগিয়ে হঠাৎ অদৃশ্য

হ'ল। এর পর আরো কয়েক রাত্রি তিনি চেষ্টা করলেন। এক-রাত্রে সঙ্গী ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন, "আরে, ঐ সে এসেছে।" পরে তিনি জানালেন একটি ভয়ঙ্কর মূর্তি তিনি দেখতে পেয়েছেন। তখন ঘরটিকে অন্ধকার করা হ'ল। মিনিটখানেক পর তিনি বলে উঠলেন, "ঐ যে সে এসেছে।" "আমার মনে হ'ল আমি দেখলাম আমার সামনে লালচে আলো জ্বলছে। আমি প্রশ্ন করলাম, প্রেতাত্মা এসেছ কি? জবাব পেলাম না। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল এ রকম ভয়ঙ্কর প্রকাশ প্রেতাত্মা ছাড়া আর কিছুর হ'তে পারে না।"

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন রবার্ট থার্সটন হপকিনস্। হপকিনস ছিলেন "পিকচার পোস্ট"-এর ফোটোগ্রাফার, বরাবরই স্পিরিট ফোটোগ্রাফীতে তিনি উৎসাহী ও আগ্রহী ছিলেন। ভূতের অস্তিত্বে তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল। "ক্যাভালকেড অব গোস্টস্" (১৯৫৬) কেতাবে তিনি ভূতের আলোকচিত্রের নানান ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ব্রিটেনের হানাবাড়িগুলির সম্বন্ধে তিনি বহু গবেষণা করে রিপোর্ট দিয়েছেন। স্কটল্যাণ্ডের গ্লামিস ক্যাসল-এর বর্ণনা তন্মধ্যে আশ্চর্যজনক। ক্যাসলটিকে তিনি উল্লেখ করেছেন "That most haunted and stately old pile, the very embodiment of a castle of romance" বলে। লণ্ডনে তাঁর একটি বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা হয়। তিনি ও কবি আর্নেস্ট ডসন কয়েক সপ্তাহ ধরে একটি অপরিচিত ভয়ংকর মূর্তির দ্বারা অনুসৃত হচ্ছিলেন। । লোকটি ডসন এর সঙ্গে একই বাসগৃহে আশ্রয় নেয়। ডসন তো ভয়ে অস্থির। কিন্তু একদিন দেখা গেল যে লোকটি বিছানায় মরে আছে। তার একমাত্র সম্পত্তি গ্লাডস্টোন ব্যাগটি খুলে দেখা গেল ভিতরে রয়েছে সমাধিক্ষেত্রের মাটি। হপকিনস্ পরে "Adventures with Phantoms" (১৯৫৮) গ্রন্থে লিখেছেন—এই হতভাগ্য ভবঘুরে আত্মাটি উপবাসী ও দয়ার প্রত্যাশী ছিল। কিন্তু তার চমকে-দেওয়া চেহারা দেখে কেউ তাকে

প্রশ্রয় দেয়নি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আত্মা তার দেহকে মৃত্যুর পরও কয়েকদিন আঁকড়ে ধরে রেখেছিল।

আর একটি ভূতের ব্যাপারে হপকিনস বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন —নরফোকের রেনহাম হলের প্রেতাত্মা। মারকুইস টাউনসেণ্ডের আবাস এই হল। লেডী টাউনসেণ্ড ইন্দ্রে সিরা নামক একজন ফোটোগ্রাফারকে প্রাসাদের কয়েকটি ছবি তুলতে নিযুক্ত করেন। সিরা তাঁর সহকর্মীসহ জাঁকালো সিঁড়িটির ফোটো তুলতে যখন উদ্যোগ করছেন হঠাৎ তখন দেখলেন সিঁড়ির নীচের দিকে বাষ্পাচ্ছন্ন একটি মূর্তি, ক্রমশ সে মূর্তি অবগুণ্ঠিতা নারীতে পরিণত হল। নারী ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকল। উত্তেজিত সিরা চট করে ফোটো নিয়ে নিল। সহকর্মী কিন্তু কিছু দেখতে পায়নি। লোকেরাও গল্পটি শুনে হাসাহাসি করল। কিন্তু ছবি প্রিণ্ট করার পর দেখা গেল সিঁড়ির উপর মানুষের একটি ভৌতিক মূর্তি, বিশেষজ্ঞরা প্লেট পরীক্ষা করে মত দিলেন ফোটোটা জাল নয়। হপকিনসও ফোটো পরীক্ষা করে অভিমত দিলেন যে ছবিটি প্রমাণসিদ্ধ। “It may well be the most genuine ghost photograph we possess.” সবচেয়ে প্রমাণসিদ্ধ ভূতের ফোটো এটি।

সাধারণত গির্জার ছবি তুলতে গিয়ে প্রামাণিক স্পিরিট ফোটো পাওয়া গিয়েছে। হ্যারী প্রাইস বলেছেন—“It is a curious fact that the clergy appear to be more frequent precipients or witnesses of psychic phenomena than men of any other calling.” এপওয়ার্থ ও বরলী এ উক্তির উজ্জ্বল উদাহরণ। কিন্তু আধুনিক যুগে জনসাধারণের মধ্যেও কেউ কেউ গির্জার ছবি তুলতে গিয়ে প্রেতাত্মার ফোটো তুলেছে নিজেদের অজানতে। আঠারো বছরের একজন কেরাণী গর্ডন ক্যারল ‘উডফোর্ডের’ গির্জায় ফোটো তুলছিল নানান কোণ থেকে (জুন ১৯৬৬)। পুরনো বাড়ি, গির্জা, দুর্গ প্রভৃতির ছবি

তুলতে ক্যারল সদাই আগ্রহী। 'উডফোর্ড চার্চ' নর্মানদের ব্রিটেনে আসবার আগে থেকেই ছিল, অতি সুপ্রাচীন। রঙিন জানলা ও বিভিন্ন স্থানের ফোটো তুলে সে ডেভেলপ করতে পাঠায়। পরে ছবিগুলি পরীক্ষা করতে গিয়ে সে বিস্মিত হয়ে দেখল যে "I had taken the picture of a monk kneeling at the altar." বেদীর সামনে প্রার্থনারত একজন সন্ন্যাসীর ফোটো তুলেছে। অথচ শূন্য ঘরে সে ছবি নিয়েছিল। "দি পিপল" পত্রিকায় খবরটি প্রকাশ হ'তে সর্বত্র তুমুল উত্তেজনা। ধর্মযাজকেরা ও বিজ্ঞানীরা ফোটো পরীক্ষানিরীক্ষা করে রায় দিলেন ছবিতে জালিয়াতি নেই। তাঁদের অভিমত পাঁচশ বছর আগেকার এক সন্ন্যাসীর জানুপেতে বসা প্রার্থনারত মূর্তি এটি।

সাসেক্স-এর 'সেন্ট নিকোলাস চার্চে' আর একটি সন্ন্যাসীভূতের ফোটো তোলা হয়। ফোটোগ্রাফারের নাম জানা যায়নি। তিনি একজন সলিসিটর। সুন্দর সুসজ্জিত বেদীর ফোটো তুলতে গিয়ে তিনি আকস্মিকভাবে এই ভূতের ছবি তোলেন।

য়ুরোপের গির্জায়ও প্রেতের ছবি ক্যামেরায় ধরা পড়ে। ফ্রান্সের ব্যাসিলিকা ডমরেমি (Basilica Domremy) ১৯ ৫ সালে সেন্ট জোয়ান-এর নামে উৎসর্গ করা হয়। ঐ বছর জুন মাসে লেডী পামার চার্চে আসেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত ব্রিটিশ সৈন্যের স্মরণে য়ুনিয়ন জ্যাক প্রতিষ্ঠাকল্পে। পতাকা প্রতিষ্ঠার পর লেডী পামারের ফোটো তোলেন মিস টাউনসেণ্ড। ফোটো ডেভেলপ করার পর দেখা গেল লেডী পামারের সঙ্গে দুটি প্রেতাত্মার ছবি প্রকাশ পেয়েছে। এ ছবি দুটি সেন্ট জোয়ান-এর আমলের দুজন ধর্মযাজকের।

আর একটি ভূতের ছবি পান ক্যামব্রিজের মিঃ এইচ. বি. কিং। 'রাইনল্যাণ্ডে ওবারডলেনডর্ফ চার্চের' প্লাটফরমের ছবি তিনি নেন—"I was alone in the church and the pulpit was quite empty." চার্চটি নির্জন, মঞ্চটিতেও কেউ ছিল না। কিং-

এর বিশ্বাস নিকটস্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত বেনিডিকটাইন মঠের কোন প্রাচীন সন্ন্যাসীর ভূত তাঁর ক্যামেরায় ধরা পড়ে।

১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে একটি ফরাসী গির্জায় ভূত ভার্জিন মেরীর মূর্তি ধরে আবির্ভূত হয়েছে বলে গুজব রটে যায়। মেট্‌জ্‌ ও নান্সি গ্রামের মধ্যবর্তী চার্চ এ ঘটনাস্থল। প্যারিস থেকে একজন ফোটোগ্রাফার ছুটে যায় এই অলৌকিক মূর্তির ছবি তুলতে। দেখা গেল, সন্ধ্যার পরই চার্চের নিকটস্থ গাছগাছালির উপর মূর্তিটি প্রকাশ পেয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ফোটো নেওয়া হ'ল। ফোটো দেখে প্রমাণ পাওয়া গেল যে যাকে মূর্তি বলে মনে করা হচ্ছিল সেটা বৃক্ষশাখার উপর আলো-খেলার চাতুরী।

হানাবাড়ির ভূত

হানাবাড়ি সম্বন্ধে পূর্বেই অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। লণ্ডনে দশ নম্বর ডাউনিং ষ্ট্রিট, প্রধান মন্ত্রীর বাসগৃহ এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ হোয়াইট হাউস, এ দুটি গৃহেই ভূত আছে বলে জনশ্রুতি বহুদিনকার। দশ নম্বর বাড়ির ভূতটি সম্বন্ধে বেশ রহস্য আছে। লোকমুখে চলিত কাহিনী হচ্ছে একজন ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রীর প্রেতাত্মা সরকারী পোশাকে সজ্জিত হয়ে বাড়িময় ঘুরে বেড়ায়। এটি বেনাভলেন্ট (শুভাকাঙ্ক্ষী) ভূত, জাতির বিপদের দিনে দর্শন দেয়। ১৯৬০ সালে এর শেষ দর্শন মেলে। মিস্ত্রীরা গৃহটির সংস্কারকার্যে ব্যস্ত ছিল, হঠাৎ দেখা গেল পিছনের বাগানে একটি অস্পষ্ট মূর্তি দাঁড়িয়ে। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে সরকারের পক্ষ থেকে রহস্যের অবগুণ্ঠন টেনে বলা হ'ল "নো কমেন্টস্", কিছু বলার নেই।

হোয়াইট হাউস এর প্রেতাত্মা যে আব্রাহাম লিঙ্কনের এ বিষয়ে সবাই নিঃসন্দেহ। প্রথমতঃ, লিঙ্কন ভৌতিক আত্মার গবেষণার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। হোয়াইট হাউসে কয়েকবার তিনি গভীরভাবে সিয়ানস-এ বসেছেন। দ্বিতীয়তঃ মিসেস এলিনর রুজভেল্ট লিঙ্কনের ভূত সম্বন্ধে একটি চমৎকার কাহিনী বলেছেন—একদিন তিনি স্টাডিতে কর্মব্যস্ত, হঠাৎ একটি পরিচারিকা উত্তেজিত হয়ে ছুটে এসে ঘরে ঢুকে বলল, "তিনি এসেছেন, বিছানার উপর বসে পায়ের জুতো খুলছেন।" "কে এসেছেন?" "কে জুতো খুলছেন?" মিসেস রুজভেল্টের এ দুটি প্রশ্নের উত্তরে পরিচারিকা জবাব দিল—"মিঃ লিঙ্কন।"

আর একজন মহামান্য ব্যক্তি এই ভূতটি দেখেছেন—তিনি নেদারল্যান্ডের রানী উইলহেলমিনা। তিনি যখন সরকারী অতিথি

হ'য়ে হোয়াইট হাউসে আছেন তখন একদা দেখতে পেলেন বারান্দা দিয়ে প্রেতাত্মাটি হেঁটে চলেছে। প্রেসিডেণ্ট হ্যারী ট্রুমান ১৯৪৫ সালে তাঁর ডায়রীতে লেখেন—"পরিচারিকারা ও খানসামারা শপথ করে বলছে লিঙ্কন কয়েকবার তাদের দর্শন দিয়েছেন।" ট্রুমান-এর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও উল্লেখযোগ্য। একদিন রাত্রে কে যেন তাঁর শোবার ঘরের দরোজায় ধাক্কা দেয়। তিনি দরোজা খুলে কাউকে দেখতে পান না। ট্রুমান বলেছেন, "I think it must have been Lincoln's ghost walking in the hall." লিঙ্কনের ভূত ছাড়া কে আর তাঁর দরোজায় ধাক্কা দেবে।

প্রেসিডেণ্ট নিকসন ও কেনেডি এ ব্যাপারে নীরব থেকেছেন। প্রেসিডেণ্ট ফোর্ড-এর অভিজ্ঞতা জানবার সুযোগ এখনও যায়নি।

চেয়ারে ভূত

আমেরিকায় ভূত দেদার। নিউ ইয়র্ক থেকে লস এঞ্জেলস, শিকাগো থেকে নিউ অরলিন্স, সর্বত্র ভূতের রাজ্যি। মানহাট্টান-এর আকাশচুম্বী প্রাসাদে, গালফ্ কোস্টের নদীর তীরে প্রেতাত্মারা আরামে বসবাস করছে। ভূত-শিকারী হ্যানস্ হোলৎসার এই সমস্ত গল্প সংগ্রহ করে বই ছাপিয়েছেন। তাঁর লেখা একটি কাহিনী খুব ইনটারেসটিং। বিষয়—একখানি পুরাতন চেয়ার। সে চেয়ার-খানিতে অধিষ্ঠান হয়ে থাকেন পূর্ববর্তী একজন মালিকের প্রেতাত্মা। চেয়ারের এ গল্পটি বিলাতের আর একটি চেয়ারের কথা মনে করিয়ে দেয়। সানবেরী-অন-টেমস-এর রসাল হাউসের আর্মচেয়ারে বসে আছে একটি প্রেতাত্মা—ছবিটি তুলেছেন সেরার্ড কুপার-কোনস্। আশ্চর্য এই ফোটো। এটি যে প্রেতাত্মা সে বিষয়ে সবাই নিঃসন্দেহ। অন্য কোন রকম ব্যাখ্যা এর চলে না।

হোলৎস-এর গল্পটি এই—নিউ ইয়র্কের বার্নাড ও যোয়ান সিমন একদা একটি সিংহাসনাকৃতি চেয়ার ক্রয় করেন। চেয়ারটি মেকসিকান ইণ্ডিয়ান কারুশিল্পের সুন্দর নমুনা। একদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ বার্নাডের ঘুম ভেঙে যায়—ঘরের আলোতে তিনি স্পষ্ট দেখতে পান একজন দীর্ঘদেহী মানুষ চেয়ারে বসে আছে, পৃষ্ঠদেশ তাঁর দিকে ফেরানো। তিনি উঠে এসে কথা বলবার আগেই মূর্তিটি হাওয়ায় অদৃশ্য হয়ে গেল। হোলৎসার নির্দেশে সিমনেরা সিয়ানস-এর ব্যবস্থা করলেন। মিডিয়ামের মারফৎ প্রেতাত্মা জানাল যে সে বার্নার্ডের পূর্বজন্মের পিতা, তারই ইচ্ছায় বার্নার্ড চেয়ার কিনেছে। পিতার খুব ইচ্ছা ছিল ছেলের কাছে আত্মপরিচয় দেয়। পিতাপুত্র তখন সানন্দে আলিঙ্গনবদ্ধ হল। প্রেতাত্মা খুশী হয়ে চলে যায়।

ভূতের অনুসন্ধানে নানা প্রতিষ্ঠান

ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ছাড়া বহু সমষ্টিগত প্রয়াস হয়েছে ভৌতিক ও অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণা নিয়ে। ১৮৮২ সালে "সোসাইটি ফর সাইকিকাল রিসার্চ" স্থাপন করেন একদল বিজ্ঞানী, অধ্যাপক ও উচ্চশ্রেণীর পণ্ডিত। তাঁরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভূতের রহস্য, স্বপ্নের মূল্য, টেলিপ্যাথী, স্বপ্নে বা অভিভূত অবস্থায় দর্শন (Vision) প্রভৃতি বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে রত হলেন। এঁদের ভিতর একটি দল শুধু ভূতপ্রেত নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। কয়েক বছর ধরে গবেষণার পর তাঁরা বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে যত সব লিখিত ও মৌখিক বিবৃতি তারা সংগ্রহ করেছেন তাদের একজায়গায় একটা আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে—সঙ্কটের সময় দর্শকেরা ভূতের দেখা পেয়েছেন। স্বভাবতই বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে অব্যবস্থিত চিত্তের সৃষ্টি হচ্ছে ভূত, ভূত Illusion (মায়া) ছাড়া কিছু নয়।

১৮৮৬ সালে "Phantasm of the living" গ্রন্থে তাঁরা এ মতবাদ প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁদের সংগৃহীত গল্পে এমন অনেক প্রেতাত্মার কাহিনী ছিল যার ব্যাখ্যা এ থিয়োরীতে চলে না। সব ভূতই বিপদের দিনে আসেনি এবং কোন মানবিক কারণ দেখানো যায়নি এ মূর্তি-গুলির আবির্ভাবের পশ্চাতে।

লণ্ডনের কেনসিংটন সোসাইটি এখনো কাজ করে চলেছেন। ভৌতিক তত্ত্ব নিয়ে তাঁরা রেখেছেন হাজার দশেক ফাইল। বহু ঘটনা মায়া (illusion), আলোর খেলা বা পরিষ্কার জুয়োচুরি বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু শুধু ব্রিটেনেই শ সাতেক ঘটনা কেন হয়েছে তার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তাঁরা দিতে পারেননি। নতুন কোন কেস তাঁদের কাছে এলে তাঁরা অত্যন্ত কঠোরভাবে জেরা করেন। দশটি মৌলিক প্রশ্নের জবাব দিতে হয় ভূতদর্শকের।

'সোসাইটি' সম্প্রতি পোলটার ভূত সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালিয়ে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তা সন্তোষজনক নয়। প্রধান গবেষক, সার উইলিয়ম ব্যারেট-এর অভিমত, কতকগুলি বিবরণ সত্য। তাঁর সহকর্মী ফ্রাঙ্ক পডমোর মনে করেন সবগুলি খবর প্রবঞ্চনাপূর্ণ, মিথ্যা।

দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান, অক্সফোর্ডের সাইকো-ফিজিকাল ইনসটিটিউট। গত বারো বছর ধরে সেলিয়া গ্রীন-(Celia Green) এর নেতৃত্বে চারজন গবেষক ভৌতিক তত্ত্ব ও ঘটনা নিয়ে গভীর আলোচনায় নিমগ্ন আছেন। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও পণ্ডিত প্রফেসর আইজেন্‌ক্। সেসিল কিং, জে. বি. প্রিস্টলে প্রভৃতি এঁদের সাহায্য দিচ্ছেন। স্বপ্ন অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব, অশরীরী ঘটনা প্রভৃতি ছাড়াও এঁরা সবাই ভূতের হানার ব্যাপার নিয়েও চর্চা করেছেন ফ্লাটবাড়িতে, অফিসে, শহরতলীর রান্নাঘরে। ইনসটিটিউট মনে করেন যেখানে দল বেঁধে সবাই ভূত দেখেন সেখানে অজ্ঞাত ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনা আছে। টেলিপ্যাথী এখানে বেশ বড় রকমের প্রভাব বিস্তার করে। জনসাধারণের কাছে

আবেদন করে ইনসটিটিউট বলতে চেয়েছেন 'অদৃশ্য কোন কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, স্পৃষ্ট, আস্বাদিত ও সুবাসিত' হলে, তা অবিলম্বে জানাতে।

আমেরিকায় ব্রিটেনের চেয়ে বেশী কাজের কাজ হয়েছে। সার উইলিয়াম ব্যারেটের বক্তৃতার ফলে (১৮৮৪) পরবর্তী বছরে বোস্টনে "সোসাইটি ফর সাইকিকাল রিসার্চ"-এর শাখা খোলা হয়েছে। এখানকার সুপ্রসিদ্ধ গবেষক হচ্ছেন উইলিয়াম জেমস, জেমস হারভে হাইস্লপ ও ডাঃ ওয়ালটার ফ্রাঙ্কলিন প্রাইস। হাইস্লপ মৃত্যুর পর ফিরে এসে পরলোকের খবর দিয়ে গেছেন। ডাঃ প্রাইস পাঁচটি বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের দ্বারা আচ্ছন্ন ডোরিস ফিশারের ঘটনা গবেষণা করেন। এঁদের সহযোগী ক্যারিংটন অস্বাভাবিক ব্যাপারস্যাপার নিয়ে অনেকগুলি বই লিখেছেন।

বর্তমানকালের সবচেয়ে নামকরা গবেষক হচ্ছেন আইলীন গ্যারেট। বহুদিন যাবৎ তিনি নিউ ইয়র্কের প্যারাসাইকলজি ফাউণ্ডেশন-(১৯৫১) এর সভাপতি ছিলেন। এ প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর সর্বত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়েছেন অতীন্দ্রীয় উপলব্ধি (Extra-sensory perception) বিষয়ে। আত্মার স্বভাব ও প্রকৃতি নিয়ে এঁরা প্রচুর অধ্যাপনা ও গবেষণা করে বেশ কিছু বই ও পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন।

ক্যারেলিনার ডিউক য়ুনিভার্সিটি পোলটার ভূত সম্বন্ধে কিছু নতুন মতবাদের প্রবক্তা। এই য়ুনিভার্সিটির কাজ অনুসরণ করছেন আর একটি প্রতিষ্ঠান (১৯৬৪), "ফাউণ্ডেশন ফর রিসার্চ অন দি নেচার অব ম্যান"। এঁদের বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন পোলটার ভূত আদৌ স্পিরিট নয়। এ প্রাকৃতিক শক্তি (physical force), মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে এর উদ্ভব। তাঁরা বলেছেন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পোলটার ভূতের আবির্ভাব ঘটেছে সেই সব বাড়িতে যেখানে ছেলে ও মেয়েরা পিউবার্টিতে (Puberty—sexual maturity) পৌঁছচ্ছে। তথাকথিত পোলটার ভূতের কার্যাবলীর সঙ্গে বর্তমান কিশোর-কিশোরীর

যৌবনোদ্গমের সম্বন্ধ রয়েছে। সম্প্রতি একটি পোলটার ভূতের ঘটনায় এ সিদ্ধান্তের মূল্য বেড়েছে। চৌদ্দ বছরের একটি ব্রিটিশ স্কুল ছাত্র অসুস্থ হয়ে শয্যাগত থাকাকালীন পোলটার তার উপর উৎপাত শুরু করে। একখানি ছড়ি (walking stick) তার চারদিকে ঘুরতে থাকে। এ দৃশ্যের ছবি তোলা হয়। সাংবাদিকেরা, গবেষকেরা এমন কি ম্যাজিসিয়ানরা এ ব্যাপার অনুসন্ধান করেন এবং স্বচক্ষে ঘটনাটি অবলোকন করেন। কোন প্রতারণা বা ফাঁকি ধরা পড়েনি।

লণ্ডনের প্রসিদ্ধ "গোস্ট ক্লাবের" (১৮৬২) কথা না বললে ভূত শিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ইতিবৃত্ত বর্ণনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এখানে ভূতশাস্ত্র বিশেষজ্ঞের বক্তৃতা শুনেছেন। অনেক হানাবাড়ির সন্ধানে এই ক্লাব দক্ষ লোকের দল পাঠিয়েছেন এবং আশ্চর্য সব ভূতপ্রেত অপচ্ছায়া সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণী প্রকাশ করেছেন। বর্তমান প্রেসিডেন্ট পিটার আণ্ডারউড তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "A Gazetteer of British Ghosts" ভূতপ্রেতের ইতিহাস সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করেছেন। বহু সত্যিকারের অপচ্ছায়ার কাহিনী তিনি শুনেছেন। বইটির ভূমিকায় তিনি একটি আশ্চর্য কথা বলেছেন, "There are more ghosts seen, reported and accepted in the British isles than anywhere else on earth."—অর্থাৎ ব্রিটেন হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ভূতপ্রেতের রাজা! তিনি অবশ্য এর কারণও নির্দেশ করেছেন—সমুদ্রবেষ্টিত বিচ্ছিন্ন এই দ্বীপগুলি ভূমধ্যসাগরীয়, স্কান্দিনেভীয়, কেলটিক প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির বাসস্থান। বাসিন্দাদের কৌতূহলী স্বভাব আর নতুন কিছু ঘটনার অলৌকিক ব্যাখ্যা গ্রহণে ব্রিটেনবাসীদের তীব্র আগ্রহ, সব কিছু মিলিয়ে ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস এখানে স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

"গোস্ট ক্লাবের" ফাইলে একটি বিস্ময়কর ফোটো আছে। গ্রীনউইচে সপ্তদশ শতাব্দীর রাণীর প্রাসাদের (Queen's House) সিঁড়ির উপর মাথায় ঘোমটা (Cowl) পরা একটা প্রেতের মূর্তি।

ক্যানাডাবাসী রেভারেণ্ড আর. ডব্লিউ. হার্ড সস্ত্রীক বেড়াতে এসে এই প্রাসাদের জমকালো টিউলিপ সোপানশ্রেণীর ফোটো তোলেন। জায়গাটা তখন নির্জন। ফোটো প্রিন্ট করার পর দেখা গেল একটি বা সম্ভবতঃ দুটি মূর্তি সিড়ি বেয়ে যেন উঠছে। পরীক্ষা করে দেখা গেল ফোটোতে কোন জালিয়াতি নেই। রেভারেণ্ড ভূতের ব্যাপারে উৎসাহী নন, তাই তিনি ফোটোটি "গোস্ট ক্লাবে" দান করেন। ক্লাব অবিলম্বে অনুসন্ধান শুরু করেন। বাড়িটি হানাবাড়ি নয় এ খবর মিলল। তবে কয়েকজন বিশ্বস্ত পুরাতন কর্মচারী বললেন যে সিঁড়ির কাছে তাঁরা অদ্ভুত মূর্তি দেখেছেন এবং মাঝে মাঝে পদশব্দ শুনেছেন।

অতি সম্পতি "স্পিরিট ফোটোগ্রাফ" চেয়ে প্রকাশ্যে আবেদন করা হয়। ব্রিটেনের নানা জায়গা থেকে ফোটোগ্রাফ ও চিঠিপত্র আসে। তাতে প্রমাণ হয় যে প্রাচীন ভূতেরা প্রাসাদে দুর্গে বসবাস করত। আধুনিক ভূতপ্রেতেরা এখন আশ্রয় নিয়েছে ফ্লাটবাড়িতে, শহরতলীর গৃহে, উদ্যানে ও উন্মুক্ত ময়দানে। কতকগুলি ছবি 'ডবল এক্সপোজারের ফল। কতকগুলি ভূতের মূর্তি খুব স্পষ্ট নয়। আমেরিকা থেকে বিচিত্র সব ফোটো এসেছিল। আকাশে খৃষ্টমূর্তি, সাধারণ ফোটোতে অপচ্ছায়ার প্রকাশ, অনুপস্থিত বালকের পোলারয়েড ছবি। একটি বিস্ময়কর গ্রুপ ফোটো পাঠিয়েছিল একজন নৌ-সৈনিক। ছবিটিতে তার একজন বন্ধু নাবিকের যে ফোটো রয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে লোকটি সম্পূর্ণ জলনিমগ্ন অবস্থায় বসে আছে। পাঁচ বছর পর এই সৈন্যটি জাপানে 'প্রিজনার অব ওয়ার ক্যাম্প', যুদ্ধবন্দী শিবির, থেকে পালাতে গিয়ে ফিলিপাইনে জলে ডুবে মারা যায়। এ ছবিটায় কি ভবিষ্যত ঘটনার ছায়া পড়েছিল ?

একজন বিশিষ্ট ও বিশ্বস্ত বিশেষজ্ঞ বলেছেন—"I am convinced at the end of my study of the overall likelihood of apparitions

—" অর্থাৎ ভূতের অস্তিত্বে সম্ভাবনা তাঁর কাছে প্রমাণসিদ্ধ। বহু বছর ধরে সংখ্যাতীত জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের সাক্ষ্য ও অভিমত এত প্রবল যে অলৌকিক ভৌতিক সত্বাকে ডান, জাল বা অলীক বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। প্রসিদ্ধ কবি ও পুরাণকাহিনী-অভিজ্ঞ রবার্ট গ্রেভসকে (১৮৯৫) ভূত বিশ্বাস করেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল— জবাবে তিনি বলেছিলেন—"One should accept Ghosts as one accepts fire-a more common but equally mysterious phenomenon It (fire) is an event rather than a thing or a creature. Ghosts, similarly, seem to be events rather than things or creatures." আগুন যেমন বস্তু বা প্রাণী নয়, শুধু 'ঘটনা', ভূতপ্রেতও তেমনি একটি 'ঘটনা', বস্তু বা প্রাণী নয়।

The camera can not lie বলে যে কথা আছে তার সত্যতা সর্বদা গ্রাহ্য নয়। জাল ও ডবল এক্সপোজারে তোলা ছবির বহু প্রমাণ মিলেছে। কিন্তু ক্যামেরা এমন সব ফোটো তুলেছে যার সত্যতা (বা খাঁটিত্ব) তর্কাতীত। সে সব ছবির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মেলে না, সাধারণ বুদ্ধিতে তার কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। জন মায়ারস্ নামে একজন মিডিয়াম অতি সম্প্রতি মৃতা ফিল্‌ম্ অভিনেত্রী ম্যারিলীন মনরোর ভূগর্ভস্থ কবরের ছবি তুলে দেখতে পান, ফোটোর উপর মনরোর মুখের আকৃতি ফুটে বেরিয়েছে। ফেক (জাল) বা সুপারইম্‌পোজিশনের ঘটনা যে এটা নয় তা প্রমাণসিদ্ধ। তবে এর ব্যাখ্যা কী ?

—শেষ-